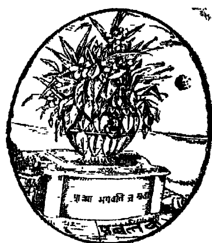
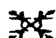
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ



শ্রীমতিলাল রায়

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ
ও
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

শ্রীমতিলাল রায়



আষাঢ়, ১৩৩৩
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
কলিকাতা।

মূল্য—দেড় টাকা

প্রকাশক—
শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ,
২৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

কলিকাতা, ৬৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট
প্রকাশ প্রেসে
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আশীর্ব্বাদ

—:০:—

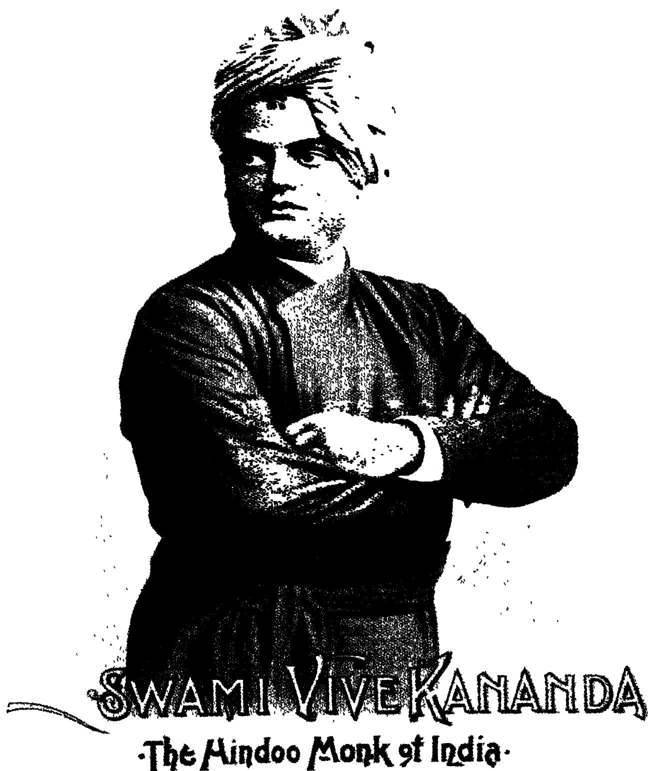
স্বামীজির আদর্শ ও উপদেশানুযায়ী জীবন আপনারা গঠন করুন এবং দেশবাসীকে যুগাচার্য্যের বাণী শুনাইয়া তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন, শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে সতত এই প্রার্থনা করিতেছি।

সতত শুভানুধ্যায়ী—

শিবানন্দ।

বিষয় সূচী

—:*:—



SWAMI VIVEKANANDA

·The Hindoo Monk of India·



যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ
ও
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

সূচনা

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার, বরাহনগরের শ্মশানে যে চিতানল জ্বলিয়াছে, তাহা অষ্টাদশ জন গৃহত্যাগী গোত্রান্তরিত মহাপুরুষের পুণ্য-অশ্রু-সিঞ্চনে বাহ্যতঃ নিভিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের বিগ্রহমূর্ত্তি স্তব্ধ মৌন প্রশান্ত হৃদয়ে সেদিন যে আগুন ঘরে ঘরে ছড়াইয়াছিলেন, তাহা এই অধঃপতিত জাতির প্রাচীন কাঠামটীকে একেবারে পুড়াইয়া ছাই না করিয়া নিঃশেষ হইবে না, বরাহনগরের শ্মশানচুল্লী ভারতের ঘরে ঘরে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠুক, আর সেই ত্যাগ বৈরাগ্যের যজ্ঞকুণ্ডে জাতি আত্মাহুতি দিয়া, পূর্ব্ব গোত্র-সংস্কার-স্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া, উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কার দিতে দিতে বাহির হইয়া আসুক, "ওঁ হরি ওঁ" "ওঁ হরি ওঁ।"

আলমবাজারে যে নব গৃহ রচনার সূচনা—যে চিতাভস্মকে সম্পদ করিয়া নূতন নগর পত্তনের সূত্রপাত, নব জাতি গঠনের সে অপার্থিব উপাদান শুধু কি বেলুড়ের শঙ্খঘণ্টানিনাদিত দেবালয়-দুর্গে রুদ্ধ থাকিবে, তাহা কি কেবল ত্যাগ বৈরাগ্যের গৈরিক লক্ষণযুক্ত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিবে,তাহা কি সহস্রশীর্ষে সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, সর্ব্বত্র বিচিত্র রূপে, বিচিত্র বর্ণে, ভাবে রসে জাতিকে সম্পৎশালী করিবে না ?

ভারতের রাম, কৃষ্ণ একাধারে যদি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে কুরুক্ষেত্রের সে পাঞ্চজন্য আজ কি কারণ ঝঙ্কার তুলিতে বিরত থাকিবে, রাঘবের কোদণ্ড টঙ্কার কেন অসুর মনকে সন্ত্রাসিত করিবে না ? ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সে মহাশক্তি যদি সঙ্কুচিত হয়, তবে হয় আমরা প্রতারিত হইয়াছি, নয় সে ভগবানের অপরাজেয় শক্তি ধারণে আমরা অক্ষম, এবং তাহার কারণ ভাবের ঘরে চুরি ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ষোল আনা দিয়া বঞ্চিত হওয়ার কথা কখনও শুনিয়াছ কি ?



ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

সূচনা

যদি কল্পনার ক্ষেত্র বিশুদ্ধ হয়, তবে একবার এই অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখ বিসর্জ্জনের মধ্যে প্রতিষ্ঠার কি সুদৃঢ় ভিত্তিপাতের আয়োজন!

ঠাকুরের শরীর ভাঙ্গিয়াছে, পরিচর্য্যার ছলে উৎসর্গীকৃত প্রাণগুলিকে তিনি একত্র করিয়াছেন। কাশীপুরের বাগান যেন তীর্থক্ষেত্র, থাকিয়া থাকিয়া গুরু গম্ভীর ধ্বনি—"অহম্ ব্রহ্মাস্মি" "শিবোহং" "শিবোহং।" রাত্রের ঘন আঁধার বিদীর্ণ করিয়া বৃক্ষমূলে ধূনী জ্বলিয়াছে, সাধনার হোমকুণ্ডে তিলে তিলে আত্মাহুতি দিয়া, ঠাকুরের সন্তানগণ তখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

নরেন্দ্র আসিয়া রোগকাতর ঠাকুরের নিকট আবদার ধরিলেন, "নির্ব্বিকল্প সমাধি চাই। শরীর ধারণের যদি প্রয়োজন থাকে, পাঁচ সাত দিন অন্তর বহিশ্চেতনার স্তরে ফিরিয়া আসিলেই চলিবে।" বলা বাহুল্য, ভারতের সাধনার ইহাই চরম লক্ষ্য, কিন্তু ঠাকুর ধমক দিয়া বলিলেন—"আরে ছিঃ, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে একি কথা! আমি জানি তুই একটা বিশাল

বট গাছ, কত তাপিত প্রাণ তোর ছায়ায় সান্ত্বনা পাবে, শীতল হবে, সেই সব চিন্তা ছেড়ে আজ ক্ষুদ্র আত্মমুক্তির কামনা!" তারপর স্নেহবিজড়িত অমিয়-নিছানি কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস! আমার সাধনা সর্ব্বতো-মুখী—আমি মাকে সমাধিযোগে শুধু এক অদ্বৈত মূর্ত্তিতেই দেখতে চাই না, আমি তাঁর অনন্তরূপের, অনন্ত সম্বন্ধ তত্ত্বের রসাস্বাদ করতে চাই, একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির আস্বাদ উপভোগ কর।"

স্বামীজীর চক্ষে সেদিন অশ্রু ঝরিয়াছিল, এই কামকাঞ্চনত্যাগী চির সন্ন্যাসীর সঙ্কেত তিনি সে দিন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরে মগ্ন থাকা তাঁর পক্ষে আর অসম্ভব হয় নাই।

যে দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, অক্ষমতার মহাপাপে পঙ্গু, সে দেশে আত্মমুক্তির প্রয়াস ভগবানের অভিপ্রায় নয়, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাই তিনি ঈশ্বরকে দীন হীন কাঙালের মধ্যে দেখিতেন, মূর্খ, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য মানবের তিনি পূজা করিতেন, প্রভুর নির্দ্দেশ পালনই ছিল তাঁর জীবনের সর্ব্বার্থসিদ্ধি,



স্বামী বিবেকানন্দ।

অনুরাগের দায়ে এমন কাঙাল হইতে আর কেহ পারে নাই, আনুগত্যের বোঝা বহিয়া এমন প্রেমের পরিচয় কোথাও বুঝি আর সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের এই নিগূঢ় সঙ্কেতটুকুর মর্ম্ম যদি না কেহ বুঝিয়া থাকে, দক্ষিণেশ্বর তীর্থ বলিয়া বৃথাই তোমরা মাথা নত কর, বেলুড়ের ধূলিকণায় গড়াগড়ি নিরর্থক, অতীতের শূন্যগর্ভ ধর্ম্মসংস্কার মাত্র।

সাধনার চরম ফল স্বামীজির করামলকবৎ আয়ত্ত হইয়াছিল, সে নিত্য সম্পদ তিনি অবহেলে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণের চরণে উৎসর্গ করিলেন। দেহ, প্রাণ, জীবন, যৌবন ইষ্টমূর্ত্তির চরণে বলি দেওয়ার অসংখ্য নিদর্শন বিরল নয়, কিন্তু জন্ম জন্ম তপস্যার প্রভাবে অন্তর্দর্শনের দুয়ার যখন মুক্ত হয়, তখন সে দুয়ার বন্ধ করিয়া, ইষ্টের আহ্বানে মুখ ফিরাইয়া যে দাঁড়াইতে পারে, তার নিঃস্বার্থ হৃদয়ের পরিচয় কেমন করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিতে হয়, কেমন করিয়া দেবত্বের অধিক গৌরব এই মনুষ্যত্বের পূজা করিতে হয় জানি না—এইখানেই তো স্বর্গ আসিয়া মর্ত্ত্যকে ধরা দিয়াছে, নির্ম্মল মন্দাকিনী-

ধারা ধুলিসমাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে আছাড় খাইয়াছে, এইখানে সার্থক হইয়াছে বসুন্ধরা—সার্থক হইয়াছে মানুষের প্রাণ,বিশ্বমানবজাতি—বিধাতার সৃষ্টি সফলতার স্বর্ণমুকুট মাথায় পরিয়া মূর্ত্ত বিগ্রহান্বিত শ্রীনরেন্দ্রে,—বিশ্বের মাথা তাই ইন্দ্রজালের মত একদিন হঠাৎ তাঁর চরণে ভূনত হইল, ভারতে বাজিয়া উঠিল জয়শঙ্খ, সে উৎসবের নহবৎ কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত প্রতি-ধ্বনি তুলিল, ভারতের সে নবজন্মের পরিচয় দিবার যুগ যেন বহিয়া না যায়—হে বাংলার তরুণ, দক্ষিণেশ্বরের নূতন ঋক্ তোমাদের অন্তরে অনাহত ধ্বনির ঝঙ্কার তুলুক, এই প্রার্থনাবাণীই ছন্দে গাঁথিয়া স্বামীজীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের আয়োজন করিয়াছি !

নির্ব্বিকল্প সমাধির চরম সোপানে অধিরোহণ করিয়া শিষ্য যখন গুরুর চরণতলে গিয়া দাঁড়াইলেন, ভাষা স্তব্ধ, সৌম্য মূর্ত্তি নরেন্দ্রের নয়নে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা—অন্তরে বাহিরে অনাবিল আনন্দের ঢেউ অবহেলে তুফান তুলিয়াছে, সে সিদ্ধমূর্ত্তি ঠাকুরের চক্ষু এড়াইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ এই অতুল সম্পদের অধীশ্বরকে কাঙাল করিয়া



ধ্যানমূর্ত্তি—বিবেকানন্দ ।

বলিলেন—"যাও আমার কাজ কর, মা আজ যাহা দেখাইয়াছেন তাহা সবই বন্ধ রহিল, চাবী রাখিয়া দিলাম, যখন কাজ শেষ হইবে তখন আজ যাহা দেখিলে, জানিলে, তাহা আবার দেখিবে জানিবে।"

দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, জীবনরহস্যের চরম মীমাংসার মুক্ত দুয়ার আজ্ঞামাত্র রুদ্ধ করিয়া, স্বামীজী ঠাকুরের কাজে জীবন ঢালিলেন। সে কি কাজ? ঠাকুরের আবার কাজ কি? করতালি দিয়া "কালী কালী" বলিয়া যে উন্মাদ নাচিয়া গাহিয়া দিন কাটাইল, ঈশ্বরের নামে চক্ষে যার অবিরল অশ্রু, ভাবে বিভোর আত্মভোলা, তার বুকে মানুষের প্রতি এত দরদ কি করিয়া স্থান পাইল রে! চিতা নিভিল, নশ্বর শরীর পুড়িয়া ছাই হইল, নরেন্দ্রের বুকে কিন্তু যে আগুন জ্বলিল তাহা আর নিভিল না, তিনি স্থির হইয়া, চিতা রচনা হইতে চিতা নির্ব্বাপণ কাল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন, শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে থাকিয়া থাকিয়া যেন বিদ্যুৎবৃষ্টি হইতেছিল, মাথার খুলির মধ্যে চিন্তার ঝড় বহিতেছিল, সহসা সব স্তব্ধ হইল, চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি "জয় রামকৃষ্ণ"

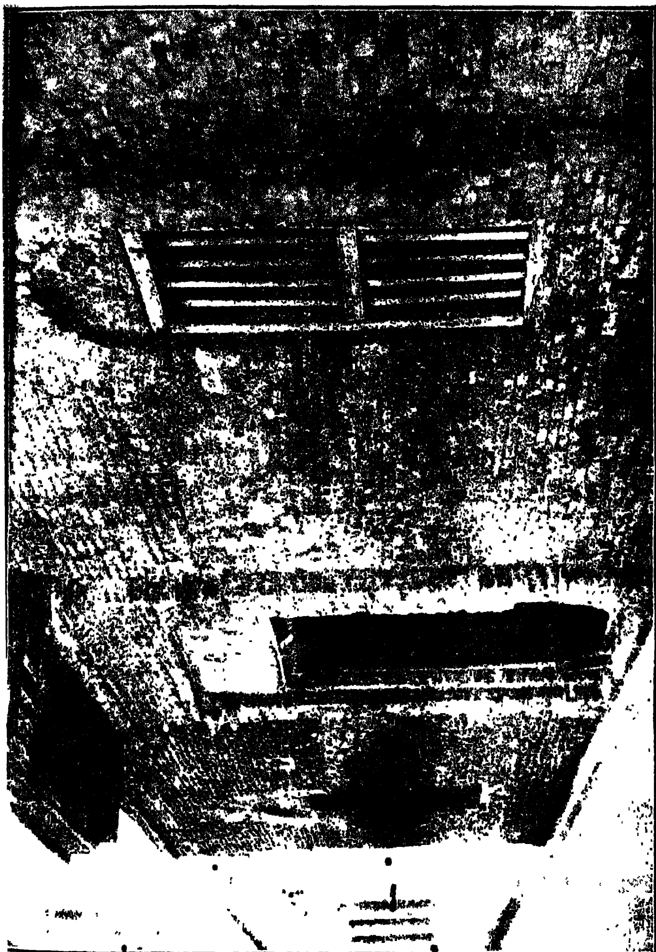
"জয় রামকৃষ্ণ" "জয় গুরুদেব"—নরেন্দ্র অনুভব করিলেন—ইহা ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান নহে, আরও অধিক শক্তি, অধিক প্রেম, অধিক জ্ঞান লইয়া ইহা তাঁর পুনরাবির্ভাব! স্বামীজী নিজের অন্তরেই ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন, সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি, চিত্ত, মন, প্রাণ প্রত্যেক ধমনী পর্য্যন্ত বিদ্যুৎপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সকলের দৃষ্টিই প্রসন্ন তেজোবীর্য্যব্যঞ্জক, এত বড় ঘটনায় কেহই যেন আর বিচলিত নয়, সকলের এইরূপ আত্মস্থ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি এক মুহূর্ত্তে নিজের ভবিষ্যৎ স্থির করিয়া লইলেন, জগদ্ধিতায় বহুজনহিতায় নরেন্দ্রের জীবন উৎসর্গীকৃত হইল, সাধনার আকাঙ্খা, নির্ব্বিকল্প সমাধির পরম শান্তি তিনি অপদার্থ জ্ঞান করিলেন—প্রেমের জয় হইল, বাংলায় নূতন তাজ মাথা তুলিল। সে নবতীর্থে, নবজাতীয়তার দীক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা সাধনা সিদ্ধির আকাঙ্খায় সমাগত, তাঁরা ব্যর্থ হইবেন; যাঁদের সাধনা আত্মমুখী—আত্মমুক্তি যাঁদের লক্ষ্য, স্বামীজীর জীবনবেদে তাঁদের অধিকার নাই। অনেকের ধারণা, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ

করাই বড় ত্যাগ, কিন্তু ইহার মূল্য আজ আর বেশী নয়, ব্যক্তিগত জীবন নষ্ট করা যেমন সহজ, ব্যক্তিগত সিদ্ধি অর্জ্জনও তদ্রূপ দুষ্কর নহে, এই ত্রিশকোটী মানবের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়া, এই ত্রিশকোটী মানবের কণ্ঠে সত্য মন্ত্রের ঝঙ্কার তোলা, এই ত্রিশ-কোটী মানবের অন্তরে শ্রীভগবানকে জাগ্রত করার সাধনার মধ্যেই এ জাতির মুক্তি নির্ভর করে। স্বামীজীর ব্যক্তিগত সাধনার চাবী যেদিন ঠাকুর লুকাইলেন, নির্ব্বিকল্প সাধনার পথে যেদিন বাধা হইয়া দাঁড়াইলেন, সেই দিন হইতে ভারতের সাধনা মোড় ফিরিয়াছে, এই রহস্যটুকু সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, স্বামীজীর জীবনকথার যথার্থ মর্ম্মবোধ হওয়া দুঃসাধ্য, তাই তাঁর জীবনকথা আলোচনা করার পূর্ব্বে এই সূচনাটুকু করিয়া রাখিলাম।

আবির্ভাব ও বাল্যজীবন

-ঃ*ঃ-

ঠাকুর দেখিয়াছিলেন—আকাশ চিরিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডল হইতে নরেন্দ্রনাথের অবতরণ—তাঁর কাজের জন্যই বিধাতা-পুরুষের এই আয়োজন, তাহা তিনি জানিতেন, এইজন্য দক্ষিণেশ্বরে ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া, নরেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না, উন্মাদের মত মধ্যে মধ্যে উচ্চকণ্ঠে নাকি অনাগতকে আহ্বান করিতেন, যেদিন কল্পনির্দ্দিষ্ট মহামিলন ঘটিল, সেদিন ঠাকুরের কাজ শেষ হইল। নরেন্দ্রনাথকে সব কিছু বুঝাইয়া দিবার জন্য যেন তাঁহাকে পাঁচ ছয় বৎসর জীবিত থাকিতে হইয়াছিল, নরেন্দ্রনাথ যেদিন তাঁর ইষ্টস্বরূপ লক্ষ্যকে অব্যর্থভাবে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেইদিন হইতে তিলে তিলে ঠাকুরের শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, মহানির্ব্বাণের তুইদিন পূর্ব্বে ঠাকুর তাই অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে



করিতে বলিয়াছিলেন, "নরেন, আমি ফতুর হইয়াছি, কাঙাল হইয়াছি!" কে কাহাকে আত্মদান করিল? জয়ী হইল কে? নরেন্দ্রনাথ, না ঠাকুর? এ হিসাব এখানে চলে না, অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর ক্ষয় অপচয় নাই, দান প্রতিদানের লীলায়, সেই এক অখণ্ড চিন্ময় সত্ত্বার প্রকাশ হয়,দক্ষিণেশ্বরের এই আত্মদানের খেলায় ভারতে নব যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

সৃষ্টির অন্তরালে যে অব্যক্ত জগৎ, যেখানে কল্পসূত্র বিধাতার হস্তে পাক্ খাইতেছে, তাহা যদি জীবের দৃষ্টিগোচর হইত—তাহা হইলে সৃজনের যে মাধুর্য্য, যে অলৌকিকত্ব তাহার কোনই মূল্য থাকিত না! ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রের যোগযুক্ত হওয়ার অভিনয় দর্শকের চক্ষে এমন বিচিত্র, এমন চমৎকার, তাহা একটী উৎকৃষ্ট কাব্য বা উপন্যাসের মতই হৃদয় মনকে মুগ্ধ করে। গ্রন্থকার যেমন রচিত চিত্রের আগাগোড়া কল্পনায় স্থির করিয়া রচনা শেষ করে, আর পাঠক তাহা অতি কৌতূহলের সহিত পড়িয়া যায়, তদ্রূপ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলনতত্ত্বের কাহিনী চিত্তাকর্ষক,

যেন বিশেষ বিশেষ ঘটনার সম্পাতেই ইহা সিদ্ধ হইল, নতুবা অন্যরূপ হইয়া যাইত, ভগবানের বিশ্বসৃষ্টি উপন্যাস রচনার মতই বিচিত্র ও রহস্যময়।

যে যুগে সাহিত্যে বঙ্কিম, সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগর, ধর্ম্মসাধনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সে যুগের নরেন্দ্রনাথ আত্মদান করিবে দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণকে— ইহা আজ যত সহজ করিয়া ভাবিবার বস্তু, সে দিন কিন্তু তাহা ছিল না, নরেন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী যুবক অশ্রুসিক্ত, সেকেলে ধরণের লোকের চরণে মাথা লুটাইয়া যে একটা ভুল করিয়া বসিল, এ প্রসঙ্গ লইয়া তাঁর বন্ধুগণের মধ্যে বড় কটুভাবেই আলোচনা হইত, নরেন্দ্রনাথ তাহা সহিতেন, আর ইহাতে তাঁর অন্তরে গর্ব্ববোধ হইত, এইরূপ বিরুদ্ধবাদের মধ্যেও ঠাকুরের মহত্ত্বই বড় হইয়া উঠিত।

নরেন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় তাঁর সহপাঠিরা পাইয়াছিল, তাই দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসার মাত্রা বাড়ার সঙ্গে, নরেন্দ্রের চিত্ত যখন বৈরাগ্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠি-



ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

তখন তাহারা ভয় পাইয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিল—"নরেন, তোমার যদি বুদ্ধি লোপ না হয়, ঐ পাগলা বামুনটার সঙ্গ ছেড়ে দাও, ও তোমার পরকাল নষ্ট ক'রবে, তোমার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, হেলায় তা হারিও না।" এই কথার সঙ্গে ঠাকুরের অযথা নিন্দা করিতেও তাহারা ছাড়িত না। নরেন্দ্রনাথ এই সকল কথা যতই শুনিতেন, ততই গম্ভীরভাব ধারণ করিতেন। বন্ধুগণ ভাবিত, বুঝি নরেন নিজের ভুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে—কিন্তু ঠাকুরের প্রসঙ্গ যেরূপ ভাবেই উত্থাপিত হউক, তাঁর অন্তরে যে ইহাতে অনুরাগের আগুন আরও ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, দূরত্বের ব্যথায় হৃদয় যে অধিকতর মোচড় দেয়, এ গভীর অনুভূতি তাহাদের ছিল না। একদিন ঠাকুরের বিরুদ্ধে আলোচনার মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। নরেন্দ্রের নীরবতাই ইহাদের প্রশ্রয় দিয়াছিল, তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর মুখ বিরক্তিপূর্ণ দেখিয়া একজন বলিল—"নরেন! যাও কোথা, ব'স।" নরেন্দ্রনাথ সে দিন আর নীরব রহিলেন না, বড় স্পষ্ট করুণাসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, তোমরা

কিছু জান না, বোঝ না, আমিও কি জানি? না আমিও জানি না, বুঝি না, আমি এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভালবাসি। ইনি মহাপুরুষ, আমি অনেক ভেবেছি, তাঁহার মহত্ত্বের অন্ত পাই নি, তাঁর জ্ঞানের সীমা নাই। তিনি মৃত্যুর আগল ভেঙ্গে অমৃত এনেছেন, তিনি জীবের মুক্তিদাতা!" নরেন্দ্রের কণ্ঠ ভারী হইয়া পড়িল, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, সে ভাববিভোর সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া সে দিন সবাই ধন্য হইল, কারু মুখে কথা বাহির হইল না—সকলেই বুঝিল, নরেন আর ফিরিবে না, সে এমন কিছু পাইয়াছে, যাহাতে সে জগতের খ্যাতি, সম্পৎ তুচ্ছ করিতে পারে। নরেন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তন আকস্মিক নহে। ঠাকুর যে হোমাপাখীর কথা বলিতেন, নরেন্দ্রনাথ হুবহু তাহাই। পুরাণে নিষ্কলুষচরিত্র শুকদেবের কথা শুনা যায়, নরেন্দ্র-নাথ তাঁর তুলনায় কোন অংশে ন্যূন নয়। শিশুজীবন হইতেই বৈরাগ্যের আগুন তাঁর অন্তরে দাবানল সৃজন করিয়াছিল, রাম-মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছিলেন, কেন না শ্রীরামচন্দ্র বিবাহিত ছিলেন। তীব্র সন্ন্যাস নরেন্দ্রের অন্তরে এই শিশুকাল হইতেই রূপ লইয়াছিল। উমানাথ



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শঙ্করের ধ্যানে তিনি বিভোর হইতেন, হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গ তাঁর কল্পনায় বড় শান্তির চিত্র ফলাইয়া তুলিত, আস্তাবলে সহিশের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন, কেন না সে বিবাহের পক্ষপাতী ছিল না, বিবাহিত জীবনের শোচনীয় পরিণামের কথা সে বালকের কর্ণে অমৃতধারার মত ঢালিয়া দিত, নরেন্দ্রের বাল্য জীবনের প্রত্যেক ঘটনা তাঁর ভবিষ্যৎকে অটল করিয়াছে।

তিনি যেমন ধর্ম্মপ্রাণ, তেমনি নির্ভীক—তাঁর হৃদয় যেমন করুণার্দ্র তেমনি বজ্রের মত কঠিন, জীবনের আদি অন্ত একসুরে বাঁধা, কোথাও লুপ্তছন্দ হইয়া ধাঁধার সৃষ্টি করে না, বাল্যের ধর্ম্মভাব ভবিষ্যতে পরিণত মূর্ত্তিতে দেশ ও জাতিকে ধন্য করিয়াছে, বাল্যের নির্ভীকতা সাহসিকতা ভবিষ্যতে জাতির সর্ব্ববিধ অধঃ-পতনের মোড় ফিরাইয়া দিতে তাহাকে দুর্জ্জয় কর্ম্ম সাধনে সাহায্য করিয়াছে, তাঁর স্বভাবসুলভ করুণা জাহ্নবীধারার মত ক্লিষ্ট তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছে, বাল্যের সকল লক্ষণই ভবিষ্যতে বিরাট মূর্ত্তি লইয়া

জাতির সার্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, এমন সর্ব্বগুণাধার মানবমূর্ত্তি কল্পনায় আঁকা সম্ভব, বাস্তবে বড় দেখা যায় না। স্বামীজী মানবচরিত্রের একটী দিব্য আদর্শমূর্ত্তি।

তাঁর শিশু জীবনেই ধর্ম্মানুরাগের পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তিনি পরিণত বয়সে বুঝিলেন, তাঁর নিদ্রা যে নিয়মে সাধিত হয়, তাহা সকল মানুষের সহিত সমান নয়, জ্যোতির্ম্ময় গোলক গড়াইতে গড়াইতে ক্রমে নয়ন স্পর্শ করিয়া যে সকলকে ঘুম পাড়ায় না, ইহা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। ধ্যান করিতে বসিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধনে যে বিশেষ প্রয়াস করিতে হয়, ইহাও তার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয়, কেন না তিনি শিবের মৃণ্ময় মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া অতি শিশুকালেই গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় অযথা বিলম্ব দেখিলে, তিনি যে ভবিষ্যতে বিরক্ত হইতেন, ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়ার ভাব প্রদর্শন করিতেন, তাহার কারণ তিনি জন্মসিদ্ধ ছিলেন। সঙ্কল্প মাত্র কার্য্যসিদ্ধি তার পক্ষে অসম্ভব

ছিল না, তিনি এই সিদ্ধি সকলের জীবনে যাহাতে দ্রুত সফল হয়, তাহার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন।

স্বামীজীর অস্পৃশ্য বোধ বাল্যকাল হইতে স্বভাবতঃই ভিত্তিহীন বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছিল। ভিন্ন জাতির উচ্ছিষ্ট ভোজনে যে জাতি যায়, একটা কিছু কাণ্ড ঘটে, এই ধারণা সত্য কি না বুঝিবার জন্য, মুসলমানের হুঁকায় মুখ দিয়া তামাক খাইয়াছিলেন। তাঁর পিতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, নির্ভীক কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, যে আমি দেখিতেছি, মুসলমানের উচ্ছিষ্ট স্পর্শে জাতি যায় কি না? বালকের উত্তর শুনিয়া তিনি যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়াছিলেন। চাঁপা গাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে, উহাতে উঠিলে ঘাড় মটকাইবে, এই কথা শুনিয়া তিনি নিঃসঙ্কোচে গাছে চড়িয়া অপেক্ষা করিতেন, ব্রহ্মদৈত্যের প্রকাণ্ড হাতখানা কখন তাহার ঘাড়ে পড়িবে —যাহা শুনিতেন তাহা প্রত্যক্ষ না করা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন না, এই বড় গুণ থাকায় তিনি ভবিষ্যতে স্বীয় অকাট্য অভিজ্ঞতাবলে এমন একটা কিছু গড়িয়া গেলেন, যাহা ভবিষ্যৎ ভারতের কেন্দ্রতীর্থ।

স্বামীজীর জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ লিখিয়া পুস্তকের অঙ্ক ভরাইতে আমাদের ইচ্ছা নাই, বাংলায় আজ এমন শিক্ষিত নারী পুরুষ কেহ নাই যিনি স্বামীজীর জীবনকথা বিশদভাবে না পড়িয়াছেন। তাঁর জীবনপ্রসঙ্গে আমাদের যে কথাটি বলিবার আছে, তাহা বলিবার ইহা উদ্যোগ মাত্র। একটি কথা উত্থাপন করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

আধুনিক যুগে—তরুণেরা অধ্যাত্ম জীবনপথে বড় বাধা অনুভব করেন, কাঞ্চন অপেক্ষা কামেরই অধিক। ইন্দ্রিয়-সুখপ্রবৃত্তি জীবনে যেমন করিয়া শিকড় গাড়িয়াছে, চির দৈন্যভরা দেশের প্রাণে অর্থের আসক্তি বুঝি ততটা জাঁকিয়া বসে নাই, আর সে আসক্তি পূরণের জন্য যে উদ্যম ও শ্রম দিতে হয়, পঙ্গু জীবন সে পক্ষে হয়তো ততটা উপযোগী নয়, অনেককেই তাই ধর্ম্মজীবনের পথে ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখি!

ধর্ম্মের অনুরাগ যেখানে সত্যই প্রবল, সেখানে কামনার আকর্ষণ যে তুচ্ছ, স্বামীজী তা আত্মজীবনে জ্বলন্ত অক্ষরে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মসাধনায়

পা বাড়াইয়া, কামের তাড়নায় অস্থিরতা, স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পরধর্ম্ম গ্রহণের দুরাকাঙ্খা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, আমরা এই সব ছদ্মবেশী ধর্ম্মসাধকদের ভিন্ন পথ অন্বেষণ করিতে বলি, এই পূত পুণ্য পথে ইহারা আবর্জ্জনাই বৃদ্ধি করে।

ভাবের ঘরে চুরি—ইহার মত বড় পাপ পৃথিবীতে নাই! যার যা ধর্ম্ম, তা যদি সে গ্রহণ না করে, তবে ব্যাভিচার অবশ্যম্ভাবী। স্বামীজীর আকুমার ব্রহ্মচর্য্য জীবনের একটী মুহূর্ত্তেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ঠাকুরের পুণ্য মূর্ত্তির অবিভাজ্য অঙ্গ রূপেই তাই তিনি স্থান পাইয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের অনাঘ্রাত কুসুমদলের একটী পাপড়িও বুঝি তাই কলঙ্কিত নয়, সরলতা ও সত্যব্রত পালনের দৃঢ় সঙ্কল্প বিরুদ্ধ তত্ত্ব হইতে সহজেই সাধককে নিষ্কৃতি দেয়, কৃচ্ছ্রতায় কোথাও জয় নাই, স্বামীজীর জীবন তপস্যার অনল-মূর্ত্তি, আত্মশুদ্ধির দায়ে কোন দিন পীড়িত হয় নাই।

যৌবনের জোয়ার যখন নামে,বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির কুঞ্জবনে তখন ফুল ফুটে, কোকিলের কণ্ঠে সুরের মূর্চ্ছনা

উঠে, ভাগবত প্রেমিকের বুকে তখনই তো অনুরাগের বান ডাকিয়া যায়, এই কৈশোরে যে এ আস্বাদ না পাইয়াছে, তার জীবন বৃথা হইয়াছে।

স্বামীজীর প্রাণে এই যৌবন যুগেই আগুন ধরিয়াছিল, সে কথা পরে বলিব। সে আকুল প্রাণের করুণ সুর যে কি মধুর, শুনি নাই কিন্তু অনুভবে বুঝি। সে সুরের গমকে গমকে ধমনী বহিয়া ঠাকুরের শোণিত স্রোত ঊর্দ্ধমুখী হইত, মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় শরীর শিহরিয়া উঠিত, কত সুধা যে ঝরিত তাহা কি আর বলিবার! এ গান শুনিয়া মুগ্ধ হইবে না কে? তাই নরেন্দ্র যখন ঘরে বসিয়া গানের লহরী তুলিতেন, পার্শ্বের বাড়ীতে এক পতিহীনা বিধবার হৃদয় দুলিয়া উঠিত, সে প্রত্যহ বাতায়নে বসিয়া অমৃত সুর প্রাণ ভরিয়া পান করিত —স্বামীজীর ইহা জানা ছিল না।

সে দিন সন্ধ্যা হয় হয়, অস্পৃষ্ট আলোকে মাথা তুলিয়াই স্বামীজী দেখিলেন, সম্মুখের দরজায় এক রমণীমূর্ত্তি—যুবতী সুন্দরী। সে কত দিন স্বামীজীকে অনিমিষ নয়নে দেখিয়াছে, মজিয়াছে, বিভোর হইয়াছে,

স্বামীজী আত্মভোলা শিব, হৃদয় তাঁর পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত না ; কে ইহার সন্ধান রাখে ? যুবতীর নয়নে অনুরাগের আলো প্রদীপশিখার মতই উজ্জ্বল, আজ সন্ধ্যার বাতাসে তাঁর কণ্ঠে যে গানের স্রোত বহিয়াছে, সে টানে সে আর গৃহে থাকিতে পারে নাই, মত্ত কুরঙ্গিনীর মত অকুলে বুঝি ঝাঁপ দেয় ! নরেন্দ্রের চক্ষে একটী মুহূর্ত্ত মাত্র বিস্ময়ের বিদ্যুৎ খেলিল, তারপর বিজয়ী বীরের মত উঠিয়া রমণীর চরণতলে আপনাকে অবনত করিয়া বলিলেন—"মা ! মা !!" একটী ধ্বনির পর আর একটী ধ্বনি কাতরতামাখা তীক্ষ্ণ শরের মত রমণীর হৃদয় বিদ্ধ করিল, স্বামীজী বলিলেন—"এখানে কেন মা ? তুমি যে আমার মায়ের মতই পূজনীয়।" চক্ষের পলকে যুবতী অন্তর্দ্ধান করিল, স্বামীজীও সে কক্ষ ছাড়িলেন, জীবনে আর সে দিকে যান নাই।

এই আত্মজয়ী বীর—যাঁর ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভাগবতময়, চিত্ত বুদ্ধি নিয়ত যুক্ত, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসের আকাঙ্খা ভগবানে পরিতৃপ্ত, তাঁর একনিষ্ঠ তপস্যার ক্ষুরধারে পৃথিবীর ঘনীভূত কলুষ চিরযুগ বিদীর্ণ হয়, ইহা চেষ্টা

নহে, ইহা সংযম নহে, ইহা স্বভাব, নিত্যমুক্ত স্বভাব, যাহা জগতের বিঘ্নে পরাজয় স্বীকার করে না, এই দিব্য স্বভাব যে প্রভাবযুক্ত হইয়া বিদ্যুৎ-বীর্য্যে জগতে নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটন করিল, তাহা চিৎশক্তি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—মণিকাঞ্চন সংযোগ, সৎ-চিতের মূর্ত্ত প্রকাশ—দক্ষিণেশ্বর তাই বড় রহস্যময় তীর্থ, সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

যুগ পরিচয়

—০॥০—

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য যুগ হইতে বাংলায় জাতীয় সত্ত্বার সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা সকল প্রতিষ্ঠান এই কালে নব মূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠে। বিগলিত প্রাচীন বাংলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া, নূতন বাংলার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন—রামমোহন, তাঁর অন্তর্দ্ধানের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয় হয়, ইঁহারা রামমোহনের মন্ত্রকে সিদ্ধ করিয়া তুলেন। বাংলার নবযুগ গঠনের আদি গুরু বলিয়া এই দুই মহাপুরুষেরও চরণে বাঙ্গালীকে চিরদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে হইবে।

দেশ ও জাতির মধ্যে যখন জাগরণের জোয়ার আসে, তখন ইহার মূল প্রবাহের ধারাটীই ভবিষ্যজাতির স্মৃতি-পূজার প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠা পায়, আর সব বিচিত্র ঘটনা

সৃজনের আশ্রয়স্বরূপ তরঙ্গের মত উঠে এবং পড়ে, ইতিহাসে তাহার রেখাপাত হয়, পূজার মন্দিরে তাদের আসন পড়ে না। বাংলার বিশৃঙ্খল পুরাতন সমাজ ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ইহাকে নূতন ছন্দে গড়িয়া তোলার প্রেরণাই ছিল যুগ-ধর্ম্ম—এই কর্ম্মে যাঁহাদের হস্ত প্রসারিত হইয়াছিল তাঁহারাই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ, আর একদল লোক ইঁহাদের কর্ম্মশক্তির অনাহত প্রবল প্রবাহ বজায় রাখার জন্যই শুধু বাধা দেওয়ার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের স্মৃতি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতির ইহা নিত্য লীলা। নব নব ধর্ম্ম, ভাব, আদর্শের প্রেরণা যে আশ্রয়ে মূর্ত্ত হইতে চায়, সেইখানেই তাঁর দান অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়, অসংখ্য বিশুদ্ধ শক্তির বিপুল বাধা তাই সহজেই অতিক্রম করিয়া যুগপুরুষগণ স্থবির জাতিজীবনে যুগে যুগে নবশক্তি সঞ্চারে ইহাকে অমর করিয়া তুলেন। বাঙ্গালী যদি আজও বাঁচিয়া থাকে, তবে ইহা অবধারিত জানিও যে রক্ষণশীল প্রয়াস তাহার মূল কারণ নহে, ভাঙ্গিয়া গড়ার বীর্য্য যাঁহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, তাঁহাদের আত্মদানেই জাতিজীবন



রাজা রামমোহন রায়।

আজ কিছু সুস্থ ও আশার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছে। সুদূর অতীতেও ইহা হইয়াছে, বর্ত্তমানের অনতিপূর্ব্বেও ইহা দেখা গিয়াছে, ভবিষ্যতেও এই নীতিই আমরা লক্ষ্য করিব।

কত বাধা রাজা রামমোহন পদদলিত করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের মূল সত্যধারার পথ যে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা যাঁরা তাঁর জীবন-কথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিদিত আছেন, আজ নারীর মর্য্যাদা রক্ষায় তরুণের প্রাণে যে উৎসাহের প্রদীপ, তাহাও এই মহাপুরুষের অশেষ লাঞ্ছনার ফলে পাওয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সর্ব্বক্ষেত্রে আজ যে আশার আলো, তাহা রাম-মোহনের রুধিরসিঞ্চনেই প্রজ্জ্বলিত, ইংলণ্ডের রাজশক্তি বাংলায় পুরুভুজের মত যখন সবখানি ঘিরিয়া ধরিয়াছে, সমাজধর্ম্মরক্ষায় উদ্যত দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিত শাস্ত্রশাসনে কল্পনার পাঁচিল তুলিয়া আত্মরক্ষায় যখন বৃথা প্রয়াস করিতেছেন, তখন রামমোহন অমিতবিক্রমে স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষায় যে অমানুষিক শ্রম ও প্রতিভার পরিচয় দিলেন, সত্যই তাহা মানুষে সম্ভব নয়,

রামমোহনকে অনেক মনীষীই তাই অতিমানুষ বলিয়া পূজা করেন।

দুর্ভাগ্য দেশের—কুপমণ্ডূকের সংখ্যাধিক্য প্রবল বলিয়া তিনি অর্দ্ধশতাব্দী হিন্দুর নিকট বিধর্ম্মী বলিয়া অনাদর পাইয়াছেন, তাঁর স্বলিখিত আত্মকথাতে তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন—"আমার সমস্ত তর্কে বিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান তাহার মতবিরুদ্ধ?"

রাজার সমাজ-রাষ্ট্র-আন্দোলনে দেশের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন হইয়াছে, তাহা আজ আর কেহ অস্বীকার করেন না। হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি সেদিন শিথিল হইয়াছিল, রামমোহনের চেষ্টায় তাহা সুদৃঢ় হইয়াছে, ইহাও কি হিন্দুজাতি অস্বীকার করিতে পারে?

হিন্দুর হিন্দুত্ব—বেদে। রামমোহনের অভ্যুত্থান-কালের বহুপূর্ব্ব হইতে বাংলায় বেদ বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি সত্য গ্রন্থের অনুশীলন লোপ পাইয়াছিল, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, বাংলার সনাতন শিক্ষা-পীঠে বেদ উপনিষদের চর্চ্চা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল, পুরাণ,স্মৃতি,ন্যায়,যাজ্যক্রিয়ার উপযোগী শিক্ষামাত্র তখন দেওয়া হইত, প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে সমাজজীবন যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, ইহাতে আর সংশয় কি ? এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন জাতির দুয়ারে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিলেন কে ? রামমোহন নহেন কি ? রামমোহনের কণ্ঠে বেদের ঝঙ্কার বাংলার সুপ্ত ধর্ম্মপ্রাণকে সেদিন চমকিত করিয়াছিল। "তত্ত্ববোধিনীতে" তাঁর একজন অনুগত শিষ্য লিখিয়াছিলেন ঃ—"বহু দিবসাবধি বঙ্গদেশে বেদের চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বেদ বেদান্তের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, শ্লোক, সূত্র ও ভাষ্য শুনিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ হইতে রামমোহন রায় যে, ভূরি ভূরি স্বমতপোষক ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য সকল

উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন, তাহাতে ভট্টাচার্য্যরা ও গোস্বামীরা অভিভূত হইয়া পড়িলেন।” পরবর্ত্তী যুগে স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্ত ধর্ম্মের প্রচার দ্বারাই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, বাংলার ধর্ম্মপ্রবাহের ইহাই কেন্দ্র ধারা, এবং রাজা রামমোহনই ইহার উৎসমূল।

১৮২৮ অব্দে রাজা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করার তিনি যে নূতন নীতি প্রবর্ত্তন করেন, তাহারই ইহা ক্ষেত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, হিন্দুধর্ম্ম হইতে ইহা যে স্বতন্ত্র কিছু নহে, তাহা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তাঁর তিরোধানে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু ১৮৪৩ অব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিংশতিজন বন্ধু লইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, ধর্ম্মবিপ্লবের আকর্ষণে হিন্দু সমাজ আলোড়িত হইয়া উঠে, মহর্ষির তপঃপ্রভাবে হিন্দুজাতি সে সময় কিরূপ উপকৃত হইয়াছে, তাহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

রাজা রামমোহনকে আত্মধর্ম্ম রক্ষার জন্য, খৃষ্টান



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

মিশনরীদের সহিত কেবল বাক্‌যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, মহর্ষি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পরই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের দারুণ অধঃপতন আরম্ভ হয়। হিন্দুকলেজের সুবিখ্যাত ডিরোজিও বাংলার তরুণ প্রাণে যে স্বাধীনতার উৎকট মদিরা ঢালিয়া দেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিলে বাঙ্গালী যে উৎসন্নের পথে ছুটিয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী ছিল না, কিন্তু অন্তরে অতিষ্ঠ লক্ষণ প্রকট হইলেও প্রতিবিধান করার সাধ্য কাহারও ছিল না। মহর্ষি কি এক অপার্থিব বলে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেন, চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল প্রভাবে উন্মার্গগামী যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁর সনাতন ধর্ম্মাঙ্কিত পতাকাতলে দাঁড়াইল, তাঁর অমানুষিক শক্তি জাতির অধঃপতন রোধ করিল। প্রাচীন মিশনরিগণ সেই দিন হইতে প্রমাদ গণিলেন তাঁহাদের কার্য্য একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল, নতুবা যখন মহেশ-

চন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস মৈত্র, উমেশচন্দ্র সরকার প্রভৃতি বাংলার উদীয়মান যুবকসঙ্ঘ খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা লইতেছিল, তখন হিন্দুধর্ম্মের মূর্ত্তি যে কিরূপ ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল তাহা সহজে অনুমেয়। বাংলার প্রাণশক্তি রক্ষায় ব্রাহ্মসমাজের দান কোন দিন এ জাতি উপেক্ষা করিতে পারে? এমন দিন আসিবে, ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দির বিশাল হিন্দু জাতির তীর্থ-ক্ষেত্ররূপেই পরিগণিত হইবে।

মহা প্রলয়ের বেগ রোধ করিয়া, নূতন সৃষ্টির ভিত্তি পত্তন করিবার উদ্যোগে মহর্ষি আপনার সবখানি ঢালিয়া দিলেন! "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বাহির করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিলেন, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত ইহাতে যোগ দিলেন, বাংলায় আবার নূতন যুগ আরম্ভ হইল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহর্ষি ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ স্পর্শ



কেশবচন্দ্র।

আস্বাদের আকুল আকাঙ্খায় তপস্যার জন্য পর্ব্বতবাসী হয়েন। তিনি দুই বৎসর পরে যখন ফিরিলেন, তখন তাঁর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁর চরণে মাথা নত করিল, তিনিও বিপুল উদ্যমে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি বিধানে মনোযোগ দিলেন। এই সময় সোণায় সোহাগা মিশিল, কেশব বাবু আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্ম-সমাজের কাজে আত্মদান করিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার অবতার—কোন বাঁধন মানিয়া চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইল না, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন কোন লক্ষণ তিনি রাখিতে চাহিলেন না, যাহাতে উহা কোন বিশিষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিতে পারে। মহর্ষি প্রথম প্রথম কেশবের সকল কর্ম্মেই সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু কেশবের উল্কামূর্ত্তি কিছুই রাখিতে দেয় নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মীদের উপবীত খসিল, শ্রাদ্ধে বিবাহে নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হইল, মহর্ষি স্বীয় কন্যার বিবাহ নব পদ্ধতি অনুসারে দিলেন, পিতৃশ্রাদ্ধও করিলেন—

উদার বিশ্বজনীন সত্য সম্মুখে রাখিয়া কেশব দেশ ভুলিলেন, জাতি ভুলিলেন, সে উদ্দাম গতির বেগ সমাজ সহিল না, কেশবের আগমনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ধ্বজদণ্ড যত উচ্চে উঠিয়াছিল, তার গতিবেগের আঘাতে উহা আবার তেমনি ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি কেশবকে আচার্য্যের পদ দিলেন—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মধ্যাহ্ন ভাস্কর প্রখর কিরণবর্ষণে কলিকাতার সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, দেশের প্রাণশক্তি এই কেন্দ্র প্রবাহে আসিয়া ঝাঁপ দিল, যুগধর্ম্মের পাঞ্চজন্য তুমুল রবে প্রতিপক্ষের হৃদয় স্তম্ভিত করিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে উহা আবার ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করিল, গুরু শিষ্যে বিবাদ বাধিয়া কেশব স্বতন্ত্র হইলেন, আবার কেশবকে বিদীর্ণ করিয়া সমদর্শীদল যুগধর্ম্মের পতাকা ধারণে হাত বাড়াইল—কিন্তু বিধাতার সঙ্কেত ছিল অন্যরূপ, হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ-শক্তি মহর্ষির প্রাণে যে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতেছিল, কেশবচন্দ্র তার বাহিরে হাত বাড়াইয়া যেমন নামহীন বিবাহপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তেমনি অজানা জগৎ হইতে শক্তি সঞ্চয়ে



বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

প্রবৃত্ত হইলেন। যে শক্তি নামিল, হয়তো তাহা এদেশের জলে হাওয়ায় গড়া আধারে সহে না, তাঁহারও সহিল না—হিন্দু নয়, আর্য্য নয়, বিশ্ব ছানিয়া তিনি এক নূতন আদর্শে বাঙ্গালীকে গড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁর সে স্বপ্ন অসমাপ্ত রহিয়া গেল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি যে নবগৃহ রচনার জন্য "ভারত আশ্রম" গড়িয়াছিলেন, যেখানে নরনারী স্বাধীন সম্মিলনের মধ্যে দিব্য শৃঙ্খলা, সুনিয়ম, ধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়া নব যুগ পত্তনের আয়োজন করিবেন বলিয়া প্রাণ ঢালিয়াছিলেন, সে কাজে তখন উপযুক্ত উপাদান মিলে নাই, কেশবের কাজে যবনিকা পড়িল, প্রকৃতি হাত ঢাকা দিলেন! কেশবের তপস্যা কিন্তু পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় প্রচারক লালবিহারী দের কথার প্রতিবাদ করিতে উঠিয়া কেশবের কণ্ঠে যে রুদ্র বিষাণ গর্জ্জিয়াছিল, তাহা বাংলার আকাশমণ্ডল হইতে সহজে মুছিবে না, যে শক্তি

তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, সত্যই সে সামান্য শক্তি নহে। কেশবের ব্যর্থতার কারণ যাহাই হউক, উহা উপলক্ষ, আসল কথা হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগ আসিয়া পড়িল, আর সে অভ্যুত্থান নব কলেবরে আসিয়া দেখা দিল—রাম-মোহনের জীবনে যে ধর্ম্মপ্রবাহ অবতরণ করিয়াছিল, সেই মূল ধারাই মহর্ষি ও কেশবকে অভিষিক্ত করিয়া, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দুকূল ভাসাইল, সে তীর্থে পুরাতনের বিসর্জ্জন, নূতনের প্রতিষ্ঠা হইল। তাই আমরা দেখিতে পাই, ভবিষ্য ধর্ম্মের মৌলিক ধারা মাথা পাতিয়া ধরার প্রেরণায় যিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পূর্ণাভিষিক্ত হইলেন, তিনি কেশবের ধর্ম্মে প্রথম আত্মদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সভায় তিনি স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-যুগের অবসানে যে বিসদৃশ চাঞ্চল্য চতুর্দ্দিকে দেখা দিয়াছিল, তাহাতে বিচলিত হইয়া নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন—ইহাই ছিল বিধাতার নির্দ্দেশ। বাংলার এই অখণ্ড অদ্বিতীয় ধর্ম্মস্রোত, যেন গিরিশৃঙ্গ হইতে গিরি-



কেশবের গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মহাভাব সমাধি।

শৃঙ্গে লম্ফ দিয়া, সমগ্র বাংলাকে ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগে দিব্য ছন্দে লীলারত, কোথা হইতে কোথায় গিয়া উহা আত্মপ্রকাশ করে, তাহা নির্দ্ধারণ করে কার সাধ্য ?

গুরু-শিষ্য

—ঃ*ঃ—

স্বামীজীর যখন আঠার বৎসর বয়স, কলিকাতায় তখন নূতন প্রাণের সাড়া উঠিয়াছে। কেশবের দল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেও, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব তখনও ম্লান হইয়া পড়ে নাই, তখনও কেশবের কণ্ঠে নবতত্ত্বের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে; বাংলার বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণে, যুবকদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, চিকিৎসা, বিজ্ঞান এমন দিক নাই এই সময় যাহাতে বাংলার প্রাণ আত্ম-দান করে নাই। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মহেন্দ্রলাল সরকার, আনন্দ মোহন, মনোমোহন, রাজনারায়ণ, সুরেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি মনীষীবর্গের বিবিধ প্রকার আত্মপ্রকাশে সমগ্র বাংলার দৃষ্টি কলিকাতার উপর পড়িয়াছে: রাজধানীর আন্দোলনস্রোত পূর্ব্ববঙ্গের প্রাণেও উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য

সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতের ভাবী কর্ণধার এই যুগে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ করায় কেমন করিয়া আত্মনিয়োগ করিতে পারেন? সর্ব্বক্ষেত্রেই তাই স্বামীজীকে উপস্থিত থাকিতে দেখা যাইত। সঙ্গীতে নরেন্দ্র পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, ব্যায়ামে যুবকদলের তিনি অগ্রণী হইলেন, কেশবের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি ভবিষ্যতে একজন বক্তা হইতে সাধ করিলেন, তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কোন বিষয়েই কৃপণ ছিল না। কলেজের পারিতোষিক সভায় তাঁর স্পষ্ট তেজোময় কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া রাষ্ট্রনেতা সুরেন্দ্রনাথ অবাক্ হইয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেও তাঁহার বাধা ছিল না, ইহাকে তিনি ভাব ও আদর্শ প্রচারের সদুপায় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সকল আন্দোলনের মধ্যে তিনি মাথা দিলেও, ভগবানের প্রতি অন্তরের আকুলতা তাঁহাকে অস্থির করিত। তিনি কেশবের মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। বেদ উপনিষদের যুগে ঈশ্বরপ্রেমের যে নিদর্শন দেখা যায়, তাহা মানুষের অন্তরে উন্মাদনা সৃষ্টি করে না, পৌরাণিক যুগের

প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণের কাহিনী শুনিতে শুনিতে নরনারীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, আর এযুগে নদীয়ার ঠাকুর ঈশ্বরলাভের আকুলতায় কেমন উন্মাদ হইয়াছিলেন, তাহার কথা শুনিয়াও মানুষের হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে ভরিয়া যায়। রামপ্রসাদের কণ্ঠ নাকি শ্রোতার প্রাণে আগুন জ্বালিত, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতটে পড়িয়া, মাটীতে মুখ ঘসিতে ঘসিতে যিনি মায়ের দর্শন ভিক্ষা চাহিতেন, তাঁর অমৃতশীল "মা মা" রবে পাষণ্ডের হৃদয় বিদীর্ণ হইত—আর ছিল নরেন্দ্রের তীব্র আকুলতার জ্বালাময় উন্মাদনা, তাঁহাকে দেখিলেই মনে ঈশ্বরভাব স্বতঃই জাগ্রত হইত, ঠাকুর তাই নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র ভাবসমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের পিতামহ ঈশ্বরপ্রেমে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁর রক্তধারায় ত্যাগ বৈরাগ্যের জাগ্রত বীজ সঞ্চরণ করিত, সহাধ্যায়িদের মধ্যে কাহারও বিবাহ হইলে তিনি ব্যথিত হইতেন, ভাবিতেন ইহার পরকাল গেল, ভগবান লাভের পথ রুদ্ধ হইল। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার পর পুত্রের বহুমূত্র রোগের

লক্ষণ দেখিয়া, তাঁর শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সাধ তাঁর পূর্ণ হয় নাই, গুরু-শক্তি ইহার বিরোধী ছিল। নরেন্দ্র পিতার নিকট মানবতার দীক্ষা পাইয়াছিলেন, আর অন্তঃকরণের সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন রত্নগর্ভা জননী ভুবনেশ্বরীর নিকট হইতে। নরেন্দ্রের কর্ণে মায়ের এই বাণী নিয়ত ধ্বনি তুলিত—"চাই সত্য রক্ষা, চাই পবিত্রতা, মৃত্যুপণ অপরের ভাব ক্ষুণ্ণ করিও না, কারু স্বাধীনতায় হাত দিতে নাই। সৎ হও, উন্নত হও, কর্ত্তব্য পালনে পিছাইও না।" সন্তানের সারাজীবন এইভাবে গড়িয়া উঠুক, এই আশায় তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, কায়মনোবাক্যে ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। সন্তানের আগাগোড়া সকল পরিবর্ত্তন তিনি অবিচলিত অন্তরে দেখিয়াছেন, কোন দিন ক্ষুণ্ণ হন নাই। নরেন্দ্র মাতৃকোলে যে দিন পৃথিবীর আলো প্রথম দেখিলেন, সে বড় সুখের দিন, সৌভাগ্যের মধ্যাহ্নসূর্য্য দত্ত পরিবারের মাথার উপর সেদিন খর কিরণ বর্ষণ করিতেছে, সে দিনও নিঃস্বার্থ অন্তরে পুত্রের

শুভ কামনা করিয়াছিলেন, পতিবিয়োগে দুরবস্থার চরমে গিয়াও, নরেন্দ্রনাথ কোন ছোট কাজে আত্ম-নিয়োগ করুক, ইহা তিনি কল্পনার মধ্যেও স্থান দেন নাই, অনাহারে দিন গিয়াছে, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহীন চক্ষে অশ্রু ঝরিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের গর্ব্বোন্নত মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি সান্ত্বনা পাইয়াছেন।

স্বার্থ লইয়া তিনি বড় হইতে চাহেন নাই, পরমার্থ লাভ করিয়া পুত্র ধন্য হউক, এই ছিল তাঁর সত্য কামনা, তাই নরেন্দ্র সংসার হইতে ধীরে ধীরে গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করিলেও তিনি তেমন কাতর হন নাই। তাঁর চক্ষের উপরেই নরেন্দ্র জন্মিল, বাল্য, কৈশোর, যৌবন অতিক্রম করিল. তাঁর চক্ষের উপরেই সংসার-বন্ধন, মাতৃস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া নরেন্দ্র সন্ন্যাস লইল, নিরুদ্দেশ হইল, বিজয়ীবেশে আবার দেখা দিল, জগদ্-গুরুর আসনে উপবেশন করিল, তার নশ্বর শরীর চিতায় পুড়িয়া ছাই হইল, সবই দেখিলেন, চক্ষে তাঁর অশ্রু ছিল না, পুত্রের অমরত্বের অনুভূতি

বড় জাগ্রত ভাবেই তিনি হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন, এমন মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তি বাংলায় আর জন্মিবে কি?

নরেন্দ্রের স্বপ্নরাজ্যে ভারতের ধর্ম্ম যখন মহনীয় বেশে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া লইতে উদ্যত, পাঠ সাঙ্গ হইলে জীবনের সবখানি দিয়া তিনি যে গৈরিক ধ্বজা ধরিয়া ভারতের ঘরে ঘরে ধর্ম্মবাণী ঘোষণা করিবেন, ইহা স্থির করিয়াছেন, ঠিক এমন সময় তাঁর মাথায় বজ্রপাত হইল, সহসা কোন এক বন্ধুগৃহে বসিয়া শুনিলেন—পিতার কাল হইয়াছে।

হৃদ্‌রোগে বিশ্বনাথ দত্ত ইহধাম পরিত্যাগ করিলে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই সংসারে অভাব দেখা দিল, নরেন্দ্র বিধবা মাতার ও অপগণ্ড ভাইভগ্নীগুলির তখন একমাত্র অভিভাবক হইলেন, কি দুঃখে যে দিন যাইতে লাগিল তাহা বলিবার নয়! বিপদের উপর বিপদ, বাস্তুভিটা লইয়া কোন এক আত্মীয় আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত করিলেন, সংসারের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্যবোধ সামান্য ছিল না, এক দিকে ধর্ম্মের আকর্ষণ, অন্যদিকে পারিবারিক বিপদ, অন্তরে বাহিরে তুমুল ঝড় বহিল—

এই দুর্য্যোগে যাঁর হাতে জীবনতরণীর হাল ছাড়িলেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে অকূলে ভাসাইলেন না, জীবের মুক্তিদাতার আসনে উঠাইয়া লইলেন, এইবার সেই পুণ্য রামায়ণ অতি সঙ্ক্ষেপে আবৃত্তি করিব।

নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন—ঈশ্বর-লাভের জন্য। নব্য বাংলার প্রাণে ধর্ম্ম-প্রেরণার প্রবাহ ব্রাহ্মসমাজই সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অমর ধর্ম্মভাবের উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্ত্তী যুগে রাষ্ট্রান্দোলনের সূত্রপাত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ইহার অগ্রণী। বাংলায় আজ ধর্ম্মস্রোত ফল্গুধারার মত অন্তরপ্রবাহী, ভারতের রাষ্ট্রসাধনা হইতে বাংলার রাষ্ট্র-চর্চ্চা তাই সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের, যাক্ এই সকল কথা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা নরেন্দ্রনাথের জীবনস্রোত সকল আন্দোলন মথিত করিয়া কি ভাবে নিজেকে হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র প্রবাহরূপে মূর্ত্ত করিল, সেই কথারই উল্লেখ করিব।

স্বামীজীর বাল্যজীবনেই ধর্ম্মের অঙ্কুর দেখা দেয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইহাকে জীবনময় করার তীব্র

আকুলতায় তিনি এক প্রকার উন্মাদ হইয়া উঠেন। সরলতা ও পবিত্রতা ছিল তাঁর ভূষণ, যাহা তিনি ধরিতেন তাহা বস্তুতঃ না পাওয়া পর্য্যন্ত মনকে চোখ ঠারিয়া চলার মত ধৈর্য্য তাঁর ছিল না, নির্ম্মল অন্তরে ঈশ্বরপ্রাপ্তির দিব্য আকাঙ্খা দিন দিন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত প্রকাশ পাইতে লাগিল। কলেজে পড়িতে পড়িতেই তিনি ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেন, বিশেষ গীতার উপর তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল, আত্মার অবিনাশিত্ব পাঠ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, যদি ইহা সত্য হয়, তবে তাহা অনুভূতিগম্য কেন হইবে না, এইদিকেই তিনি ঝুঁকিয়া পড়িতেন, ধর্ম্মকে মূর্ত্ত করিয়া ধরার সঙ্কেত লাভের জন্য তিনি কেশবের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন, আর সে যুগে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মরাজ্যের সম্রাট, তিনি সময় পাইলেই তাঁর অমৃত বাণী শুনিয়া অন্তরে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতেন। এইরূপে ধর্ম্মানুরাগের প্রথম যুগে তিনি একপ্রকার শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। খাঁটী ধর্ম্মানুরাগী যে, তার

পক্ষে ধর্ম্মানুশীলনের কয়েকটী নীতি লইয়া সান্ত্বনা লাভ অসম্ভব। জীবনের সবখানি ধর্ম্মময় না হইলে ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, যাঁহাদের চরণরেণুর স্পর্শে দেশ ও জাতি ধন্য, তাঁরা জনে জনে ধর্ম্মেরই বিগ্রহমূর্ত্তি ছিলেন, স্বামীজীও এই হেতু অধিক দিন ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে প্রকৃত ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না—উপদেশাদি শ্রবণে হৃদয়ে অপার্থিব পুলক জাগিত, যখন তিনি শ্রীভগবানের কীর্ত্তনে আত্মহারা হইতেন তখন স্বর্গীয় আনন্দে সব যেন ভরিয়া যাইত, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইত না, ধর্ম্মের অখণ্ড মূর্ত্তি হইতে হইলে যে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন, তাহার সঙ্কেত লাভের জন্য আকুল হইলেন। তাঁর এইরূপ ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া মহর্ষি যথাসাধ্য তাঁহাকে সাধনার পথে সাহায্য করিতেন, কিন্তু অন্তর তাহাতে তৃপ্ত হইত না, ইহা মহর্ষির ত্রুটি নহে, স্বামীজীর জীবনসূত্র ধরিয়া অলক্ষ্যে এই সময় হইতে এক মহাপুরুষ আকর্ষণ করিতেছিলেন, স্বামীজীর বহিশ্চেতনায় ইহা তখন ধরা না পড়িলেও, অন্তশ্চেতনায় টান ধরিয়াছিল, এই

সময়ের তীব্র ব্যাকুলতার লক্ষণ এই অন্তর-রহস্যেরই অভিব্যক্তি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁর প্রতিবাসী ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আগমন করেন। নরেন্দ্রের সুকণ্ঠের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছিল, ঠাকুরকে গান শুনাইবার জন্য নরেন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। ঠাকুরের সহিত স্বামীজীর ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ, উভয়ের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধের বাঁধন, সেদিন তার সন্ধান নরেন্দ্র নাথ অনুভব করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁর গানে তৃপ্তি পাইয়া স্নেহবিজড়িত দৃষ্টিতে যুবকের দিকে বার বার তাকাইয়া কি যেন বলার ছিল, সে দিন তাহা বলিতে পারেন নাই। ইহার পর হইতেই নরেন্দ্রের অন্তর ঈশ্বরলাভের প্রবল আকাঙ্খায় দিন দিন কাতর হইয়া পড়ে, তিনি একদিন উন্মাদের ন্যায় মহর্ষির নিকট গিয়া স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন, "মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?" মহর্ষিকে এমন কথা বলার স্পর্দ্ধা তখন

নরেন্দ্র কেন, কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষেও প্রগল্ভতা। কিন্তু নরেন্দ্র অন্তরে শান্তি না পাইয়া এই ধারণা করিয়াছিলেন যে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না করিলে, তাঁর এই অন্তরজ্বালা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না, মহর্ষি যদি সত্যই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবেই ইহা সম্ভব হইবে, এবং ইহা স্পষ্ট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাই ভাল, তাই তাঁর সরল প্রাণে ইহাতে কোন কুণ্ঠাই উদয় হয় নাই।

যুবকের কথাগুলি যেমন অন্তর্ভেদী, তাঁর চক্ষেও তেমনি আকাঙ্খার দিব্য অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, মহর্ষি সহসা এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্রের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তিনি দেখিলেন এদৃষ্টি মানুষের নয়, এমন স্বচ্ছ নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু মানুষের হয় না, তিনি সস্নেহে উত্তর দিলেন, "বৎস! তোমার চক্ষে যোগীর দৃষ্টি দেখিতেছি"—নরেন্দ্র তখন উন্মাদ, মহর্ষির কথার মর্ম্ম বুঝিলেন না, ভাবিলেন মহর্ষি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন নাই, কৈ তিনি সে কথা স্বীকার করিলেন? কে আমায়



স্বামীজীর মাতা ভুবনেশ্বরী।

ঈশ্বর দর্শন করাইবে ? নরেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িলেন। বাড়ী আসিয়া কলেজের পুস্তকগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—সব বৃথা, জগতের দর্শন সাহিত্য সেই অনির্ব্বচনীয় সত্তাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম, অথচ তিনি সৎ, সর্ব্বত্র অবস্থিত, যদি ইহাই সত্য হয়—কেন তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না! ঈশ্বর-দর্শনের ব্যথায় মর্ম্ম যেন ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল, তাঁর এই সময়ের অবস্থা দেখিয়া প্রতিবাসী স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে উপদেশ দিলেন. নরেন্দ্রের মনে হইল, দেখি রামকৃষ্ণকে অনেকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করে, তিনি ইহার সদুত্তর দিতে পারেন কি না!

কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর বড় অল্প দূর নয়। নরেন্দ্রনাথ একজোড়া চটী জুতা পায়ে দিয়া, চাদর কাঁধে ফেলিয়া বাটীর বাহির হইলেন, মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রের প্রতি মূহূর্ত্তের পরিবর্ত্তন লক্ষ্যে রাখিতেন, নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা যাও ?" নরেন্দ্র বলিলেন—"রামকৃষ্ণের কাছে!" ভুবনেশ্বরীর হৃদয়ে অকস্মাৎ একটা

ব্যথার আঘাত বাজিল, অন্তঃকরণে অনেক ভাবের উদয় হইল, একবার ভাবিলেন—ভবিষ্যতের সঙ্কেত বেশ স্পষ্ট হইয়াই ধরা দিল, কিন্তু তিনি তাহা আমলে আনিলেন না।

নরেন্দ্রনাথ দুই একবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, ঠাকুরের প্রতি তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধার বীজও পড়িয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহা কোন বিশেষ ভাব সৃজন করে নাই, তবে আজ পথে যাইতে যাইতে অন্তরে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল, মনে হইল যদি ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হন, ইহা ভাবিতেও যেন ব্যথায় হৃদয় ভারী হইয়া উঠে! কেন? কি জানি—বুঝি তবুও ঠাকুরকে ত্যাগ করা সম্ভব হইবে না, হায় এমন করিয়াই তো মানুষ মজে, আপনাকে যাচিয়া দেয়! নরেন্দ্রনাথ কেশবের নিকট গিয়াছিলেন, আদর্শ লাভের জন্য, মহর্ষির নিকট ধর্ম্মলাভের আশায় যাওয়া আসা করিয়াছেন। কিছু পাওয়ার আশা যেখানে, সেখানে অহেতুক শ্রদ্ধা জাগে না। এই অহেতুক প্রেমের বান ডাকিলেই তো মানুষ পাগল হয়। যাহা

চাওয়ার বস্তু তাহা আর চাওয়া হয় না, যাহা পাওয়ার ছিল তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। এমনই আবেগের তরঙ্গ নরেন্দ্রের হৃদয়কে দুলাইয়া দিল, কিন্তু তিনি সঙ্কল্পসিদ্ধ ছিলেন, হুকুমে ভাবের আবর্ত্ত স্থির করিয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন তিনি একাই বসিয়া আছেন, মাথা নত করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, কণ্ঠ দৃঢ়, স্বর অকম্পিত, চক্ষে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ, উচ্চ শির, নরেন্দ্রের প্রতিবর্ণে ঠাকুরের শরীরে দিব্য হর্ষ জাগাইয়া তুলিল, কি ভুবন-ভুলান হাসি! নরেন্দ্রের এতখানি কঠোর গাম্ভীর্য্য-মূর্ত্তি সে হাসির তরঙ্গে গলিয়া দ্রব হইল—কি আশ্চর্য্য! ঠাকুর উত্তর করিলেন—"হাঁ রে, আমি ঈশ্বর দেখেছি, এই যেমন তোকে দেখ্‌ছি, তবে সে আরও ঘন, আরও মধুর, আর তোরেও তা দেখাতে পারি।" সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইল। স্বামীজীর গর্ব্বদৃঢ় বচনগুলি যেন এক আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কত দিনের উৎকণ্ঠা, কত অশ্রু, কত আকুলতা, সব ঘুচাইয়া এ কি অমৃতশীতল কণ্ঠের সান্ত্বনা—শুধু কি

কথায় ? নিদাঘের চাতক আকাশে শীতল স্বচ্ছ বারি-পাতে যেমন তৃপ্ত হয়, নরেন্দ্রও তদ্রূপ যেন একটা বাস্তব স্পর্শের অনুভূতি পাইয়া ধন্য হইল, সনাতন ভারত তার সিদ্ধ সম্পদ লইয়া, নূতনকে বরণ করিয়া বুকে লইল, নবযুগের এই সন্ধিপূজায় শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ডালি দিতে, উদ্যোগী তরুণ—যাত্রা সুরু করিবে কি ?



দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ মন্দির।

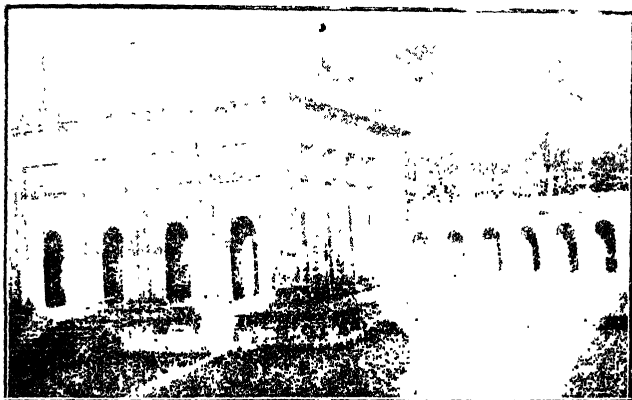
দক্ষিণেশ্বর

-ঃ*ঃ-

দক্ষিণেশ্বর তন্ত্রসাধনার নবতীর্থ। বৈষ্ণব সহজিয়ার বৃন্দাবন। ধর্ম্মানুভূতির ভিত্তি ধরিয়া যদি এ জাতির মুক্তি নির্ভর করে, তবে দক্ষিণেশ্বরের মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষা লইতে হইবে। যে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদি মন্ত্র কুরুক্ষেত্রে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা দক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিয়াছে। ভারতের সর্ব্বধর্ম্ম এইখানেই সার্থক হইয়াছে, রূপান্তরিত হইয়াছে, আমরা আজ যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া মুক্তির প্রত্যাশী—তাহা মৃতের উপাসনা, দক্ষিণেশ্বরে ধর্ম্মের যে নব বিগ্রহ গড়িয়া উঠিল, তাহা আমরা ধরিতে পারিলাম কৈ? . .

ঠাকুর স্মৃতি, পুরাণ মান্য করিয়া, লোকাচার মাথা পাতিয়া, একে একে প্রচলিত, অপ্রচলিত সকল ধর্ম্মই পালন করিলেন, খ্রীষ্টকে বুঝিবার জন্য খ্রীষ্টান হইলেন,

মহম্মদীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করার জন্য মুসলমান হইলেন, নৈষ্ঠিক ও রাগাত্মিক ভাবসাধনায় সিদ্ধ হইলেন, বাকী রহিল না কিছু, বৈদিক যোগে সিদ্ধ হওয়ার জন্য তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস লইলেন, তার পর কণ্ঠে যখন নূতন বেদ ঝঙ্কার দিল, তখন সে অমিয় বাণী শুনিতে আসিল না কে ? গৌরী পণ্ডিত আসিল, পদ্মলোচন আসিল, বৈষ্ণবচরণ আসিল, পণ্ডিত শশধর আসিল, কেশব, প্রতাপ, বিজয়কৃষ্ণ, স্বামী. দয়ানন্দ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, কেহ তো বাকি রহিল না। ঠাকুর ভবিষ্যতের জন্য নির্দ্দেশ দিলেন কি? দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে, কোন সাধক তো আজ আর 'মা মা' বলিয়া তাঁর মত আকুল কণ্ঠে আর্ত্তনাদ তুলে না? পঞ্চবটীমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে, সকল পাশমুক্ত হইয়া কাহাকেও তো দিবারাত্র ধ্যানমগ্ন দেখি না? শান্ত-সখ্য-বাৎসল্য-রসের সাগরে ডুব পাড়িয়া কেহ তো আজ আর ভাবসাধনায় বিভোর নয়? তাঁর সাধন-নীতি কারু জীবনে তো আঁক কাটে নাই, ভবিষ্যতের জন্য কি রাখিলেন, কোন্



কালীবাড়ীর ফটক



পঞ্চবটী।

সূত্র অবলম্বন করিয়া এ জাতি সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে ?

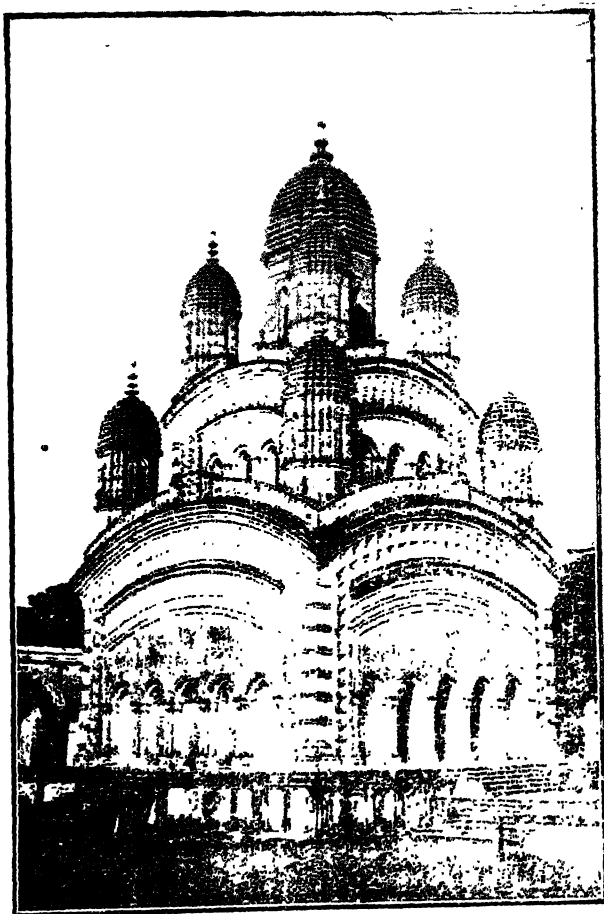
যদি দৃষ্টি থাকে, যদি ঠাকুরের নির্দ্দেশ ধরিবার মত শ্রদ্ধা থাকে, তবে বুঝিয়া দেখ, ভবিষ্য যুগের জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ যোগের দীক্ষা দিয়াছিলেন, সে অধ্যাত্ম যোগের জাগ্রত নির্দ্দেশই তাঁর কণ্ঠে উদাত্ত অনাহত ধ্বনি তুলিয়াছে। গিরীশ চন্দ্র যখন দুইবারও মন্ত্র জপিতে অস্বীকার করিলেন, তখন তিনি বকলমা দিতে বলিলেন, এই অপার্থিব করুণাধারা না বহিলে অন্নগত কলির জীব নিস্তার পাইবে কেমন করিয়া! দক্ষিণেশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য যেন ফুঁ পাড়িয়া আজও বলিতেছে —"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"— নির্ভয় হও, আমায় সব উৎসর্গ কর, কর্ম্মক্ষেত্রে সকল দুর্গতি হইতে আমিই তোমায় মুক্তি দিব—ভবিষ্য ভারতের তাই আর ধর্ম্মসাধনা জীবের মুক্তিপন্থা নহে, যোগই সাধ্য,

যোগপথেই ভারতের মুক্তি একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেছে।

এ যোগ জীবে ও ব্রহ্মে! জীব অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের খণ্ডত্ব, ভূমার অংশ যখন পূর্ণ হয় তখনই সিদ্ধি। ঠাকুর পূর্ণ ব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবান—জীবের বন্ধন মুক্ত করিয়া অখণ্ড ব্রহ্মানন্দে ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতরণ করেন।

নরেন্দ্রনাথ—নবযুগের মানবপ্রতিনিধি। জীবে ব্রহ্মে যোগ-পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য সৎ-চিতের লীলায় দক্ষিণেশ্বর ধন্য, ব্রহ্মবারি জাহ্নবীধারায় অবগাহনে যেমন পাপক্ষালন হয়, দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য ধুলিস্পর্শেও তদ্রূপ কলুষ ক্ষয় হইয়া থাকে, সে প্রত্যয় লইয়া কয় জন তীর্থযাত্রা করে?

ঠাকুর দুই একবার নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পরই, নূতন মন্ত্রে তাঁকে দীক্ষা দেওয়ার প্রয়াস করিয়া-ছিলেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়, ক্রমে তাহা দৃঢ় অধ্যাত্ম সম্বন্ধের বাঁধন সৃষ্টি



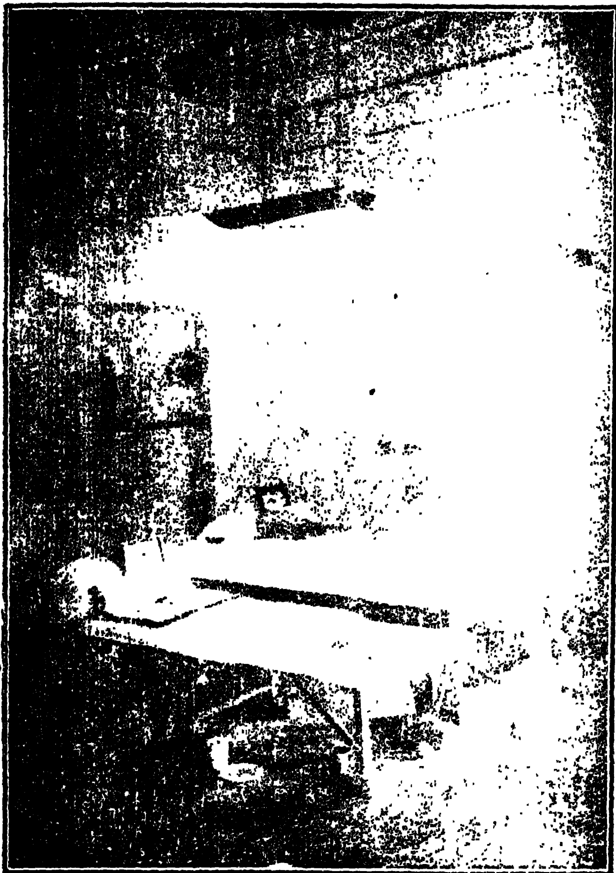
দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির

করে, এই আভাসটুকু পাইয়াই ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রের কানে কানে বলিয়াছিলেন—"নরেন, তুই ব্রহ্ম; আমি কালী।" সে দিন সে কথাটা নরেন্দ্রের কাণে ভাল লাগে নাই, ঠাকুরকে বদ্ধ পাগল বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাই যে পরম জ্ঞান—তাহা যখন বুঝিলেন, তখন শ্রদ্ধায় তাঁর হৃদয় ভরিয়া উঠিল, আর তখনই তিনি দেখিলেন, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত নহেন, তিনিই ঈশ্বরের দিব্য বিগ্রহমূর্ত্তি, সেই দিনই নরেন্দ্র ঈশ্বর দর্শন করিয়া সাধনার ফাঁদ কাটালেন, জগৎকে মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার অধিকার লাভ করিলেন।

কত সংশয়, কত দ্বন্দ্ব, কত চাঞ্চল্য যে জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কত অত্যাচার সহিয়া যে ঠাকুর তাঁর চিহ্নিত সন্তানের অন্তরে সত্যকে মূর্ত্ত করিয়াছেন, কি অসাধারণ ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা লইয়া তিনি নরেন্দ্রের জীবন সার্থক করার জন্য যে উদ্‌গ্রীব থাকিতেন, তাহা যতই ভাবা যায়, ততই মনে হয়, এত করুণা ছিল বলিয়াই তো তুমি ধরা পড়িলে, নতুবা কে তোমায়

চিনিত ? বনকুসুমের মত বনে ফুটিয়া বনেই তুমি ঝরিয়া পড়িতে—বিশ্বজন তোমার নামে মুক্তিলাভের অধিকার পাইত না।

নরেন্দ্র তুই একবার যাওয়া আসা করিয়াই ভাবিলেন—লোকটা বদ্ধ পাগল, আর তার নিকট নেশাখোরের মত যে একদল তরুণ কথায় কথায় চক্ষু বুজিয়া ঝিমায়, তাহারাও ইহার কাছে থাকিয়া মাথার দফা খাইয়াছে। ঠাকুরের অনুরোধে যখন গান করিতেন, তখন পাগ্‌লামীর চূড়ান্ত মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিত, ঠাকুর নরেন্দ্রকে বাহু বেষ্টনে ধরিয়া বলিতেন, "নরেন! নরেন!! কত দিন তোর প্রতীক্ষায় আছি, বিষয়ী লোকেদের সঙ্গে কথা কহিয়া ঠোঁট পুড়িয়া গেল, আজ সব শীতল করিলি!' নরেন্দ্র তো অবাক্! এমন পাগল আর কোথায় আছে ? তবে শরীরও যেন ঝিমাইয়া পড়িত, সমস্ত আব্‌হাওয়ায় যেন রিম্ রিম্ ঝিম্-ঝিম্ ভাব, শান্তি ও আনন্দের নেশা জমিয়া উঠিত, ইহা তো ভাল কথা নহে, তাহার মাথাটাও কি খারাপ



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শয্যাগৃহ

করিবে? নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

কিন্তু বিধাতার বাঁধন টুটিবে কেমন করিয়া? এত বড় বিরুদ্ধ তত্ত্বটাকে আত্মসাৎ করার জন্য ঠাকুর এক প্রকার উন্মাদ হইলেন, ব্যাধ যেমন শীকারের সন্ধানে ফিরে, ঠাকুরের দশাও তাই হইল, নিজে যখন শ্রান্ত হইয়া পড়েন, তখন অন্য ভক্তকে বলেন, "যা তো, নরেনের খবরটা নিয়ে আয়। আর সে কেন আসে না—জিজ্ঞাসা করিস্!' নরেন বাহিরে দূরে দূরে থাকিলেও ভিতরে মাকড়শার জাল বুনা হইতেছিল, দূর তাঁহাকে নিকটে টানে, সে বড় কম সোয়াস্তি নয়, যাহাকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তার প্রতি যে সহজ টান, তা ঘন করার সহজ উপায় যদি মিলে, ছাড়ে কে? তবুও সংশয় ছাড়িতে চাহে না, নরেন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্যাঁচ কষিতে ছাড়ে না, সংশয় কিন্তু প্রত্যয়কেই গাঢ় করিয়া তুলে, এমনই ভাব লইয়া একবার দুই তিন মাস পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে যাওয়া তার বন্ধ হইল।

ব্রাহ্ম সমাজে উৎসব। সহরের যত গণ্যমান্য

শিক্ষিত লোকের সমাবেশ হইয়াছে, উপাসনামন্দির পত্রপুষ্পে সুশোভিত, বেদীতে আচার্য্যের প্রশান্ত মূর্ত্তি, নত শিরে ভক্তমণ্ডলী গান গাহিতেছিল :—

"তোমারেই করিয়াছি
জীবনের ধ্রুবতারা"

গমকে গমকে সঙ্গীতের সুর সুধার উৎস মুক্ত করিয়াছে, নরেন্দ্রের কণ্ঠ বাজিয়াছে—উৎসবক্ষেত্র মধুময়, বড় পবিত্র স্তব্ধতায় সর্ব্বস্থান পুলকিত। গান থামিল—ভাবের গাম্ভীর্য্য, অনুভূতির গভীরতায় উপাসনাক্ষেত্র মহিমাময়, সহসা সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কাতর কণ্ঠ শুনা গেল—"নরেন! নরেন!!" কণ্ঠ চিরিয়া সে ডাক বাহির হইয়াছে, শুধু শব্দ নয়, ডাকের সঙ্গে অন্তরটীও বাহির হইয়া নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিল, তিনি আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন—দেখিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। মনে মনে ভাবিলেন, কেন এমন' করিলেন, লোকে যে সত্যই ইঁহাকে :উন্মাদ মনে করিবে—কি অপার্থিব মমতার সহিত এই চিন্তার তরঙ্গটী যে উঠিল, তাহা উপলব্ধির ধন, বর্ণনার নহে, ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিয়া

আনন্দে আত্মহারা হইলেন—"কেন তুই এতদিন যাস্ নি, আমি যে থাকৃতে পারি না" প্রভৃতি ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, নরেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে সভা-ক্ষেত্র ছাড়িয়া বাহির হইলেন।

এমন একদিন নয়, বহুদিন ঠাকুর নরেন্দ্রের বিরহে কাতর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। নরেন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন. "আপনি আমায় এত করিয়া ভাবেন কেন? ইহাতে যে আপনার ক্ষতি হইবে, ভরতরাজার মত, আপনি মরণেও মুক্তি পাবেন না।" ঠাকুর অন্তর্য্যামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া নরেনকে উত্তর দিলেন, "তুই বলিস্ কি? তোকে চিন্তা কর্‌লে আমার মুক্তি হবে না? মা বল্‌লেন, তুই নারায়ণ, নতুবা তোর মুখ দেখে কে?" ঠাকুর তাঁর সন্তানদের এইরূপ চক্ষেই দেখিতেন, তবে তো তারা জনে জনে ভবিষ্যতে পুণ্যময় মূর্ত্তিতে কত অসংখ্য আঁধার হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিলেন, বাংলায় নূতন যুগ প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইলেন।

ধর্ম্মের অনুরাগ যতদিন বুদ্ধিগত—ততদিন ইহা বস্তুতঃ জীবনকে ধন্য করে না, সমস্ত জীবন দিয়া, ধর্ম্মানুভূতি

না হইলে, পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব। নরেন্দ্র ঠাকুরকে ভালবাসিয়াই এতদিন কাটাইলেন, নবানুরাগের আবেগ ক্রমে মন্দীভূত হইল, ঠাকুরের কথা পর্য্যন্ত শুনিতে বিরক্ত বোধ করিতেন, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন —"তোমার কথা শুনিতে আসি না, ভালবাসি বলিয়া আসি"—ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতেন, এই অনুরাগটুকু রক্ষা করিতে পারিলেই তো একদিন তিনি জয়ী হইবেন। নরেন্দ্রের বুদ্ধিবৃত্তি যখন প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে দেখা দিল, তখন তিনি ঠাকুরের কথায় কথায় প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন, ইহাতে অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী ক্ষুণ্ণ হইল, ঠাকুর প্রশান্ত চিত্তে, নরেন্দ্রের উগ্র প্রতিবাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া, আত্মমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। নরেন্দ্রের অহঙ্কার তখন চরমে উঠিয়াছে— একদিন এমন হইল, যে তিনি নরেন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এই উৎকট ঔষধ তখন প্রয়োজন হইয়াছিল। যে নরেন্দ্রকে না দেখিলে রামকৃষ্ণের চক্ষে অশ্রু ঝরে, যার সুখ্যাতি বচন জপমন্ত্র, সকলের উপরে স্থান দিয়া যাকে তিনি জীবনের



সাধন কুটীর।

ধ্রুবতারা করিয়াছেন, এক মুহূর্ত্তে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করায়, নরেন্দ্রের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল, প্রথম বড় অপমান বোধ হইল, নিজের পাণ্ডিত্য,প্রতিভা, শ্রেষ্ঠত্বের গরিমায় মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল, মনে করিলেন আর এদিকে আসিব না—কিন্তু হৃদয় তিনি হারাইয়াছিলেন, বাহিরে দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিলেন, বুঝিলেন এ পৃথিবীতে তাঁর আর অন্য কোন স্থান নাই, এ হৃদয় কোথাও গিয়া আর তৃপ্তি পাইবে না, জন্মজন্মান্তরের এ অমর গ্রন্থী মোচন হইবার নয়, অশ্রুসিক্ত নয়নে ঠাকুরের পায়ে গিয়া পড়িলেন! নরেন্দ্রনাথের এইরূপ নতি দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, ভক্ত ও ভগবানের মিলনের পথ এইবার প্রশস্ত হইল— নরেন্দ্রনাথের হৃদয়গ্রন্থী এই আঘাতে ছিন্ন হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের আনন্দবাজারে তিনি বহুদিন কেবল ভাবের বেচা কেনাই করিলেন, ঠাকুর কিন্তু নরেন্দ্র-নাথকে ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন, অপরাপর ভক্তদিগকে তিনি ভক্তিমূলক পুস্তকাদি

পড়িতে উপদেশ করিতেন, নরেন্দ্রনাথ অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতেন, ঠাকুর তাঁহাকে এই দিকে অধিক উৎসাহ দিতেন। তাঁর এইরূপ বিপরীত আচরণ দেখিয়া, তিনি যদি প্রশ্ন তুলিতেন, যে আমি ব্রহ্ম, এই ভাবের গ্রন্থাদি পড়িলে অহঙ্কার হইবে, তবে তিনি তাহার উত্তর দিতেন,"আমি কি তোর জন্য ইহা পড়িতে বলি, আমি শুনিতে চাই, তার জন্যই পড়িতে বলি"—নরেন্দ্রনাথ আর কোন কথা কহিতেন না। কি চমৎকার শিক্ষানীতি, মানুষ গড়ার কৌশল!

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে ভক্তিভাবের অপেক্ষা জ্ঞানের প্রভাব অধিক ছিল, ঠাকুর তাহা বুঝিতেন, নরেন্দ্রনাথকে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত মনে করিতেন, উপমা দিয়া এমন কতবার বলিয়াছেন, যে কেশব প্রভৃতি তৎকালীন দেশের মনীষীগণের যে জ্ঞান তা বাতির আলো, নরেন্দ্র স্বয়ং জ্ঞান-সূর্য্য—সকল দিক দিয়া নরেন্দ্রনাথকে তিনি অধিক করিয়া দেখিতেন—চরিত্র সম্বন্ধেও যদি কেহ অন্যরূপ কিছু বলিত, ঠাকুর বিশেষ বিরক্ত হইতেন, তাঁর অকাট্য



বেলতলা

বিশ্বাস, নরেন্দ্রের কখন কোন কারণে পতন হইবে না।

এই বিশ্বাসের কি অতুলনীয় প্রভাব স্বামীজীর চরিত্রে কার্য্য করিয়াছে! কোন সময়ে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া একস্থানে উপস্থিত হন, সেখানে গণিকা লইয়া নৃত্য গীত হইতেছিল, নরেন্দ্রের অটল চরিত্র পরীক্ষা করার জন্যই নাকি এইরূপ আয়োজন করা হয়, প্রথম তিনি বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইবেন ভাবিলেন, পরে তাহা ঘটিয়া উঠিল না, বন্ধুগণও তাঁহাকে বারাঙ্গনার নিকট একা রাখিয়া সরিয়া পড়িল, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ঠাকুরের জ্ঞানবৈরাগ্যপ্রদীপ্ত মূর্ত্তিটী যেন ভাসিয়া উঠিল; আর রক্ষা নাই, তিনি নানা প্রকার সদুপদেশ দ্বারা এই পতিতা নারীর অন্তরে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিলেন, সে স্বামীজীর চরণধূলি লইয়া ধন্য হইল, বন্ধুগণ ইহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরের প্রথম দর্শন হইতে যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসা করেন, তার প্রথম দুই বৎসর তেমন ঘন ঘন যাইতেন না, এই সময় নরেন্দ্রের

জন্য ঠাকুরেরই আকুলতা অধিক দেখা যাইত। তারপর তৃতীয় বৎসর নরেন্দ্র যেন চুম্বক আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে না আসিয়া আর থাকিতে পারিতেন না, ঠাকুরের বীজ তখন অঙ্কুরিত, চতুর্থ বৎসর দক্ষিণেশ্বর এক প্রকার ভাত-ঘর হইয়া উঠিল—ঠাকুর অঙ্কুর পুষ্ট করিতে আত্ম-দান করিলেন, নরেন্দ্রনাথের রূপান্তর ঘটিল। পঞ্চম বৎসর দক্ষিণেশ্বরই তাঁর বাসস্থান হইয়া উঠিল, ঠাকুরের তিরোধান পর্য্যন্ত নরেন্দ্রনাথ আর ঠাকুরের সঙ্গছাড়া হন নাই। এই পাঁচ বৎসর, নরেন্দ্রের সবখানি ভাঙ্গিয়া তিনি গুঁড়া করিয়া দিলেন, আমূল উপড়াইয়া নবভিত্তির উপর তাঁর জীবন প্রতিষ্ঠা করিলেন ; বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ, অশেষগুণসম্পন্ন নরেন্দ্র মানবতার আদর্শ-চরিত্ররূপে সমাজে স্থান পাওয়ার যোগ্য ছিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে ভারতের ধর্ম্মবিগ্রহরূপে গড়িলেন—সাধন-শাস্ত্র, হিন্দুত্বের নিগূঢ় মর্ম্মের মূর্ত্ত দেবতা করিয়া তুলিলেন। স্বামীজীর উপাসনায় ভারত নব হিন্দু-ধর্ম্মের স্বরূপ লাভ করিবে, প্রাচীন ভারতের সহিত এই নব হিন্দুত্বের বিরোধ আছে, কিন্তু গোঁড়ামী ছাড়িলে

দেখা যায় প্রাচীনকে পূর্ণ করিতেই স্বামীজীর আবির্ভাব।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে নানা বিকৃত বিধানে হিন্দুধর্ম্ম আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতেছিল, পাশ্চাত্যের সম্মোহন হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে অসমর্থ হইতেছিল, সকল প্রয়াসের মধ্যেই বৈদেশিক ভাব কিছু না কিছু থাকিয়া যাইতেছিল, ইহাতে হিন্দু-ধর্ম্মের সনাতনত্ব খর্ব্ব হইয়া পড়ে; ভারতের ধর্ম্ম যদি সনাতন হয়,তবে হিন্দুধর্ম্মের অবিকৃত বিকাশই বাঞ্ছনীয়, যে নিত্য-পূর্ণ, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য বাহিরের উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় না, স্বয়ং প্রকাশ হইয়া বিশ্বকে সে ধন্য করে—দক্ষিণেশ্বর সনাতন ধর্ম্মের তীর্থ, ঠাকুর ইহার পূর্ণাবতার, স্বামীজী তা বিশ্বময় প্রচার করিয়াছেন, স্বয়ং সিদ্ধরূপে। স্বামীজীর জীবন-চরিত্র-লেখক সত্যই বলিয়াছেন—

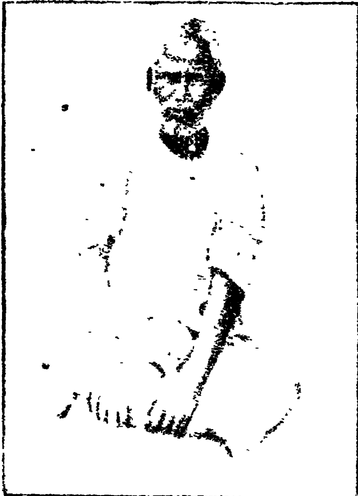
"Sri Ramkrishna the teacher, Vivekananda the preacher, Sri Ramkrishna the man of insight, Vivekananda the

prophet of that insight, these two were as one."

এই একাত্মানুভূতির সাধনাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলনতত্ত্ব। ঠাকুরের সাধনা—জীব হইতে শিবে পৌঁছান, হিন্দুত্বের অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বকে জীবনগত করা, তিনি তাহাতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন—জীবনব্যাপী সাধনার ফল সকল জীবনে সঞ্চারিত করার কৌশলও তিনি আবিষ্কার করিলেন, আত্মমর্ম্ম নরেন্দ্রনাথকে দান করিয়া। গীতার ইহাই উত্তম রহস্য।

স্বামীজী ঠাকুরকে ভালবাসিতেন—স্বামীজীর অন্তর পবিত্র ও সরল ছিল, কাজেই এই ভালবাসা চরমে দাঁড়াইল, ষোল আনা এক হইল। সংশয় দ্বন্দ্ব আসিয়া স্বামীজীকে ব্যথা দিয়াছে, কিন্তু ভালবাসার স্থলে ঘা দিতে পারে নাই, একনিষ্ঠ প্রেমের বলেই তিনি ঠাকুরের কঠোর সাধনলব্ধ জ্ঞান পাঁচ বৎসরে আয়ত্ত করিলেন।

একই অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু বিশ্বপ্রকাশের হেতু। বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলেই, ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, যাহা সহজ, নিত্য, শাশ্বত, তাহা কেবল উপলব্ধি নহে, জীবনময় করা এত দুঃসাধ্য,



স্বামী অদ্ভুতানন্দ।



স্বামী অখণ্ডানন্দ।

তার কারণ মায়া, যাহা আমাদের ভ্রান্ত করিয়াছে। ঠাকুর এই তত্ত্ব সহজে বোধ করাইবার জন্য, নরেন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে ঠোক্কর দিতেন, নরেন্দ্র তাহা তখন ভাঁওতা বলিয়া উড়াইতেন, কালে দেখিলেন, এই ভাঁওতাই পরম ব্রহ্মজ্ঞান।

উদাহরণস্বরূপ—আমরা দেখি, মাঝে মাঝে তিনি বলিতেন—"তুই ব্রহ্ম, আমি কালী—তোর মধ্যে শিব, আমার মধ্যে কালী, এই দুই এক, একই দুই"—এই সকল কথার যে কোন অর্থ আছে, নরেন্দ্র প্রথমে বুঝিতেন না, ঠাকুরের পাগ্‌লামী ভিন্ন ইহা যে আর অন্য কিছু নহে, ইহাই ছিল তাঁর অটুট ধারণা।

ঠাকুর আরও উৎকট ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া তিনি ঘরখানিতে বসিয়া আছেন, নরেন্দ্রনাথ গান গাহিতেছে, সে দিন সুরধুনীপ্রবাহ যেন তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতেছিল, দূরে পঞ্চবটীর শাখায় শাখায় আঘাত দিয়া বাতাস লুকাচুরি খেলিতেছিল, ঘর বারান্দা, প্রাঙ্গন যেন উৎসবময়, গানের সুরে আর ভাবের ঘোরে ঠাকুর ও ভক্তগণ

বিহ্বল, হুঁস কারু নাই। গান থামিতেই ঠাকুর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, মাতালের মত চরণ দুখানি টলিয়া পড়িতেছে, বিভোর ঠাকুর দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াইয়া নরেন্দ্রনাথকে কাছে টানিয়া আনিলেন আর একখানি পা তার ঘাড়ে তুলিয়া দিলেন। নরেন্দ্র দেখিলেন, যেটুকু চেতনা তাঁর ছিল, তাহাও লোপ পায়, মিনতি-কাতর কণ্ঠে একবার বলিলেন—"করেন কি? করেন কি? আমার যে মা বাপ আছে, বাড়ী ঘর আছে।" হায়রে—এই সব তো সকলেরই থাকে, বুদ্ধের ছিল, শঙ্কর, রামানুজেরও ছিল; যে দেহচেতনার উপর ভর করিয়া জীবন ধারণের ব্যবস্থা তাহাতে সব রাখা চলে, ব্রহ্মজ্ঞানের বুলিও মুখ দিয়া বাহির হয়, ব্রহ্মস্বরূপ হইতে হইলে এ দেহচেতনার পারে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, ঠাকুর নরেন্দ্রের জন্মগত চেতনার গণ্ডী ভাঙ্গিলেন। কিছুক্ষণ জ্ঞানহীন স্তব্ধতার পর, যখন পুনঃ চেতনার সঞ্চার হইল, তখন নরেন্দ্র বুঝিলেন, পূর্ব্ব দেহের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দৈহিক সোয়াস্তির একটা আস্বাদ তিনি অনুভব করিলেন, আর মনের বলও যথেষ্ট বাড়িয়া

গিয়াছে, তাজা মন, তাজা শরীর লইয়া সেদিন বাড়ী ফিরিলেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে, পূর্ব্বে যে বস্তু লইয়া তর্ক করিতে হইত,তাহা বোধগম্য হইল। মানুষের স্বভাব-নিয়ন্ত্রিত মন বুদ্ধি উচ্চ তত্ত্বের মহিমা অবধারণে অসমর্থ হইয়া বৃথা আন্দোলন করে। নরেন্দ্রের নিকট ক্রমে গোপীপ্রেম আদরের বস্তু হইল। পূর্ব্বে ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রেমতত্ত্ব উত্থাপন করিলে স্বামীজী বিরক্ত হইতেন, মানুষ-মনের নৈতিক নিরিখ্ গোপীর আত্মদান বুঝে না, ঠাকুর তবুও বুঝাইয়া বলিতেন, কৃষ্ণ স্বয়ং প্রেম, উহা না পুরুষ না নারী—কামের রেখা কৃষ্ণচন্দ্রের বদনে কি দেখিতে পাও? বালকের সরল কোমলতায় ও বালিকার নম্র হৃদয়ের ভাবময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, ভুবনমোহন রূপ নারী পুরুষের ভক্তি অর্ঘ্য তাই তাঁর চরণে স্বতঃই উৎসর্গীকৃত হয়, এই গুণময় কৃষ্ণমূর্ত্তি যদি মনুষ্যমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন, তবে মনুষ্য সে প্রেমের সাক্ষাদ্দর্শনে কেন ধন্য হইবে না? কালীর কথায় বলিতেন,—কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কালী—দুই এক, একই দুই, কালী ধ্বংস করেন, তিনি মৃত্যুর দেবতা। মরণ হয় বাসনার, যাহা আবরণ,

সৎকে ঘিরিয়া আছে! কালী এই আবরণ ভেদ করিয়া, সাধককে অমৃতের অধিকারী করেন, কালের বুকে চড়িয়া কালী অনন্তকেই আবিষ্কার করেন, মরণের আবর্ত্তে অমৃতের সন্ধান দেন, কালীর কৃপা হইলেই তাঁর ঐ কাল বেশের আড়ালে যে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম লুকাইয়া আছে, তাই ধরা পড়ে, কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কালী বলিতে বলিতে, তাঁর এক হস্ত উপরে উঠিয়া পড়িত, অপর হস্ত বরাভয় আকার ধারণ করিত, নরেন্দ্র ভাবিতেন, মন্দিরের মূর্ত্তি বুঝি ইহাতেই প্রকট হইয়াছে, অন্যান্য ভক্তদের বলিতেন,—মন্দিরে গিয়া কি করিব, সাক্ষাৎ কালী দর্শন করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

নরেন্দ্রনাথের অন্তর একেবারেই রূপান্তরিত হইল, ঠাকুরের মুখে যতই ভাগবত বিষয় শ্রবণ করিতেন, তিনি বাণীর দিকে অধিক মনোযোগ না দিয়া ঠাকুরের মূর্ত্তির দিকেই অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন; সংশয় তখনও একেবারে বিদূরিত হয় নাই, ভাবিতেন—ইনি কি মানুষ, না ব্রহ্মেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ! হায়,

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানাভিমানী শ্রেষ্ঠ মনীষী—তোমার এই ভাবান্তরে শিক্ষিত সমাজের গর্ব্বোন্নত শির চিরদিনের মত ধূলায় লুটাইল, মানুষে ভগবানের প্রতিষ্ঠা করিয়া ঈশ্বরলাভের দুয়ার তুমি মুক্ত করিলে—নবযুগের প্রবর্ত্তক, তোমায় নমস্কার।

ভগবানের সহিত মানুষের মিলন হয়—যোগে। সে যোগ চিত্তবৃত্তির নিরোধ। নির্ব্বিকল্প সমাধি ছিল না ঠাকুরের লক্ষ্য, লক্ষ্য ছিল লীলা। নিত্য লীলার ধারা অখণ্ড আকারে ভারতে চির প্রবর্ত্তিত, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের ইহা সনাতন নীতি। চিত্ত যতক্ষণ বিষয়-সহযোগে ব্যাপৃত, ততক্ষণ ইহা বিষয়াকার প্রাপ্ত হইয়া রহে, সে চিত্তে ভগবানকে ভগবান বলিয়া ধরা যায় না, বিষয়বৎ প্রতীয়মান হয়, তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে ভাগবত প্রত্যয় অসম্ভব। ছুঁচের ছিদ্রে উষ্ট্রের গমনাগমন বরং বিশ্বাসযোগ্য, বিষয়ী মনে ভাগবত ধারণা কোন দিন বিশ্বাস করিও না, বিষয়ী যে ঈশ্বর-নাম উচ্চারণ করে, তাহা সত্যের ছদ্মবেশী সংস্কার, আসল অনুভূতি নহে। এই চিত্তের পরিবর্ত্তন সাধনায় হয়,

ইহারই জন্য কঠোর অভ্যাসের প্রয়োজন। চিত্তবৃত্তির লয় নির্ব্বিকল্প সমাধির একমাত্র উপায়, লীলার পথে যাঁরা পা বাড়াইয়াছেন, তাঁদের চিত্তকে ভগবন্মুখী করিতে হয়, ইহাও চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধন, তবে লয় নয়, ঈশ্বর-বিষয়ে নিয়োগ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের কালীতে চিত্ত নিয়োগ করিয়া, কালীর মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন.। ষড়দর্শনে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে না, চিত্তবৃত্তির একান্ত নিয়োগে তাহার আবিষ্কার হয়, হিন্দুর যোগশাস্ত্রে এ কথার খুব জোর উল্লেখ আছে। চিত্ত ভাগবত আকার পাইলেই যে সিদ্ধিলাভ হইল এমন নহে, ইহা জ্ঞানগত করা চাই, তারপর জীবনময় করার সাধনা। ঠাকুর পর পর এই তিনটী স্তর অতিক্রম করিয়া, সাধ্য বস্তুতে আপনাকে ডুবাইয়া পুনঃ উঠিয়া আসিলেন—সেই ভাগবৎ সত্তারই বিগ্রহমূর্ত্তি-রূপে। নরেন্দ্রের সাধনাও এই একই বিধি ধরিয়া সাধিত হয়, ঠাকুরের সাধ্য কালী, নরেন্দ্রের সাধ্য রামকৃষ্ণ, এই তত্ত্ব বুঝিলেই যে বাংলার ভবিষ্য ভাগবৎ-সাধনা ঐ ইউনিভার্সিটীর পাশ করা বিদ্যার মত

সার্ব্বজনীন হয়—বুঝি তাহা হইবার উপায় নাই—ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন:—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততে সিদ্ধয়ে
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

তেত্রিশকোটি নরনারীরপূর্ণ ভারতে আত্মজ্ঞানে প্রযত্নবান সহস্র সহস্র নরনারী মধ্যে, একসহস্র নারী-পুরুষও কি ভাগবতবিগ্রহরূপে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করিবে না?

মহামিলন

—:*:—

সে দিন বোধ হয় জ্যোৎস্না-রাত্রি ছিল। মন্দিরে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি তুলিয়া নীরব হইল। নহবৎ বাজিল, করুণ মিঠা সুর—দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, মন্দির, প্রাঙ্গন,পঞ্চবটী, বেলতলা, মথুরবাবুর বৈঠকখানা, সমস্ত উদ্যানভূমি, চাঁদের আলোয় বিধৌত সাদা ধব্‌ধব্‌ করিতেছে, সকল বস্তুর ছায়া মাটীর বুকে, দেয়ালের গায়ে আলোয় আঁধারে স্বপ্নপুরী রচনা করিয়াছে। উদ্ভাসিত ভাগীরথীবক্ষে উজ্জ্বল হীরকচূর্ণ জ্বলিতেছে। এক প্রহর রাত্রি অতীতপ্রায়, সারাদিন ঠাকুরের সংসর্গে থাকিয়া, সন্ধ্যায় সবাই যখন বাড়ী ফিরিল, নরেন্দ্র আসিয়া সেই যে পঞ্চবটির বেদীতে বসিয়াছেন, আর উঠেন নাই। তাঁহার আজ সব কথা মনে উঠিতেছে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সেই যে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে



স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।



স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনাটি জীবন্ত মূর্ত্তিতে দেখা দিল,—চিত্ত আজ রামকৃষ্ণময়। চেতনার স্তরে, বেদ বেদান্ত উপনিষদের বিচিত্র যুক্তি, অনুভূতি, সত্যের বহুমুখী প্রবাহ সব কিছুকে কেন্দ্রীকৃত করিয়া জীবনময় করা, আর তাহা লইয়া বুদ্ধির অনুশীলন, এই উভয়ের পার্থক্য যে কতখানি, তাহা তিনি আজ তলাইয়া বুঝিতেছিলেন —রামকৃষ্ণ হিন্দুত্বের চরম সত্যমূর্ত্তি, তাঁর জীবনের প্রতি ছন্দে বেদের ঋক্ ঝঙ্কার দেয়, উপনিষদ মূর্ত্তিমান, স্মৃতি পুরাণের ব্যাখ্যা তাঁর কথায় আচরণে প্রকাশ হয়। গঙ্গাজল হাতে লইয়া এমন সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রহ্মবারির অনুভূতি কয়জন হিন্দুর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে? রাধা-কৃষ্ণের দিব্য সম্বন্ধের পরিচয়, এমন পবিত্র অমিয় কণ্ঠে কে উচ্চারণ করিয়াছে? মন্দিরে মন্দিরে শিবলিঙ্গের মাথায় গঙ্গাজল ঢালিয়া—আপনাকে হারাইয়া কে এমন শিব হইয়াছে? ঠাকুরই তো হিন্দুধর্ম্মের বিগ্রহমূর্ত্তি। ইহা যে প্রত্যক্ষ, ইহা যে বাস্তব। এই চার পাঁচ বৎসরের প্রতি মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে যে আজ ইহা দিব্য হইয়া ধরা

দেয়। কোথাও তো অন্ধতা নাই! বিচার বিশ্লেষণের ক্ষুরধার দিয়া চিরিয়া চিরিয়া ঠাকুরকে দেখা হইল। দেখিতে দেখিতে তো ভূয়া হইল না, সত্যের মহিমা বাড়িল, সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ধন্য হইলেন। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে নরেন্দ্রের হৃদয় অভূতপূর্ব্ব পুলকরসে শিহরিয়া উঠিল।

ভারতের ধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম। ঠাকুর সেই হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণাবতার! কোথায় ইহার সংস্কারের প্রয়োজন? এমন পূর্ণাঙ্গ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন কি কারণ করা দরকার, তিনি বুঝিলেন না। বরং চাই সত্যের প্রচার।

এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম—স্বয়ং ব্রহ্ম। বেদে উপনিষদে যে মন্ত্র-ব্রহ্ম, ভারতের জাতি তাহার প্রকাশমূর্ত্তি, হিন্দু-জাতি ব্রহ্মেরই সমষ্টি, তাই অমর, ব্রহ্ম যে নিত্যবস্তু। এই যে অনুভূতি, ইহা ব্রহ্মদর্শনেই জাগে, নরেন্দ্রের ভাগ্যে আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে, তাঁহার চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িল।

কি প্রশান্ত আনন্দময় মূর্ত্তি—সংশয়ীচিত্তে সত্য-প্রকাশের কি অকাট্য শিক্ষানীতি! হিন্দুত্বের মর্ম্মমন্ত্র কি



স্বামী তুরীয়ানন্দ।



স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

সরল সহজ কথায় ব্যক্ত করার কৌশল, আর তা উপলব্ধি করাইবার জন্য কি আকুল ব্যগ্রতা! হিন্দু ব্রহ্ম, অতীত যাহা, অনাগত যাহা, তাহাও ব্রহ্ম, বেদে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, যাহা হয় নাই—তাহাও ব্রহ্ম, আত্মা ব্রহ্ম, দেবতা ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্মময়। 'নেতি নেতি' করিয়া বুঝার অপেক্ষা 'ইতি ইতি' করিয়া বুঝিতে অধিক রস জন্মে, ব্রহ্মসাধনা রসের সাধনা, তাই তিনি মুসলমানধর্ম্মে ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য সদাচারী ব্রাহ্মণ হইয়াও মুসলমান হইয়াছিলেন, খৃষ্টধর্ম্মের জন্য খৃষ্টান হইতে তাঁর বাধে নাই, অস্পৃশ্য মেথরের বিষ্ঠা পরিস্কার করিয়াছিলেন, ঘরের সিক্ততা দূর করিতে মাথার দীর্ঘ কেশ দিয়া ঘরের জল মুছিয়াছিলেন, ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার এমন করিয়া দূর না হইলে, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মপ্রকাশ কি মানুষের আধারে সম্ভব হয়,—রামকৃষ্ণ কালী, রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম।

. .

মনে পড়িল, কত তর্ক, তাঁর কথার কত তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তিনি বিরক্ত হন নাই, একদিন তর্কের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধারের জন্যই তিরস্কার করিয়া-

ছিলেন। কি করুণাময় মূর্ত্তিই না প্রকাশ হইল, যখন বিদ্যাভিমান ছাড়িয়া তাঁর চরণে গিয়া আছাড় খাইলাম —ব্রহ্ম কি, ধর্ম্ম কি, শাস্ত্র কি প্রভৃতি তর্কে গলা চিরিয়া যখন রক্ত বাহির হইবার উপক্রম, তখন তিনি ডাকিয়া গঙ্গার ঘাটে লইয়া গেলেন, আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইলেন —একদল কুকুর! কয়েকটা লাফালাফি করিতেছে, কয়েকটা চীৎকার করিতেছে, কয়েকটা বা মৃতদেহ জল হইতে টানিয়া চিবাইতেছে, কলহ করিতেছে—তিনি হো হো করিয়া হাসিলেন, কি মর্ম্মভেদী হাসি, বুঝিলাম সত্য না পাইলে এইরূপ কুকুরের মত, অনর্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, সকলের মুখ গম্ভীর হইল, ঠাকুরের হাস্য-মুখর চাঞ্চল্য নির্ব্বাত দীপশিখার মত নিশ্চল হইল,—সে কি শান্তি! আনন্দের পথে টানিয়া লওয়ার এমন সদুপায় কোথাও দেখা যায় না, তিনি শিক্ষকের শিক্ষক, গুরুর গুরু, স্বয়ং শিব, ব্রহ্ম-কালী, একাধারে পুরুষ-প্রকৃতি, তাঁকে নমস্কার—নরেন্দ্রের মাথা নত হইল।

অন্ধ বিশ্বাস বলায় ভক্তগণের হৃদয় বিচলিত হইলে, ঠাকুর বলিলেন—"নরেন, অন্ধবিশ্বাস কি রে? বিশ্বাসের



স্বামী অদ্বৈতানন্দ



স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

চোখ আছে নাকি, যে বিশ্বাসকে অন্ধ বলিস্? হয় বল বিশ্বাস, নয় বল জ্ঞান। বিশ্বাসকে তুই তুই দেখিস্ কেন? এক বিশ্বাসের চোখ আছে, এক বিশ্বাসের চোখ নেই?”

সেদিন লজ্জায় মাথা নিচু হইয়া পড়িল। এমন যুক্তি তো কারু মুখে শুনি নাই, যাহা শিখিয়াছি, তাহা ভুলিবার জন্য তাইতো কিছু ঔষধ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ভগবান মুর্ত্ত কি অমূর্ত্ত, এই লইয়া কলহের মাত্রা যখন হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম করিত, ঠাকুর বলিতেন, “গোল করিস্ কেন? তিনি মূর্ত্তও বটে, অমূর্ত্তও বটে, আবার ইহার অতীতও বটে, তিনি যে অনন্ত, সকল সম্ভাবনা তাঁতে যে বর্ত্তমান।” এই গভীর শাস্ত্রীয় যুক্তি উপেক্ষা করার সামগ্রী নয়, এমনই করিয়া তিনি আমাদের নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

কত কথা—অবশেষে ঠাকুরের আগাগোড়া জীবন মনে উদয় হইল—কামারপুকুর গ্রাম হইতে কলিকাতার চতুষ্পাটী, দক্ষিণেশ্বরের কালী প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরের যত কথা শুনিয়াছিলেন,

দেখিয়াছেন, সব চিত্তে জমা হইয়া তাঁহাকে রামকৃষ্ণময় করিয়া তুলিল। যখন রামকৃষ্ণে চিত্তবৃত্তি পূর্ণ একাগ্র, তখন ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন—নরেন্দ্রের বাহ্যচেতনা লুপ্ত হইয়াছে, অন্তরে অভাবনীয় শক্তির অনুভূতি জাগিয়াছে, নরেন্দ্র তখন রামকৃষ্ণময়! কে এই রামকৃষ্ণ? ভগবান—পরাৎপর ব্রহ্ম! নরেন্দ্র তখনই ভক্ত শিষ্য। ঠাকুরের সহিত যোগসূত্রে আনন্দমগ্ন। ঠাকুরের মুখে হাসির বিদ্যুৎ ফুটিল, চিহ্নিত সন্তানের চিত্ত জয় করিয়া, তিনি ভবিষ্য ভারতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকার আয়োজন করিলেন। নরেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিলে দেখিলেন, ঠাকুরের প্রসন্ন মূর্ত্তি,—ঠাকুর শিষ্যকে, ছাত্রকে, ভবিষ্য ভারতকে সঙ্গে লইয়া আরও নির্জ্জন স্থান, বেলতলায় গিয়া বসিলেন। এইখানে কতদিন উভয়ে উভয়ের মধ্যে আত্মবিনিময় করিয়াছেন—কখনও রামকৃষ্ণ নরেন্দ্র হইয়াছেন, আবার নরেন্দ্র রামকৃষ্ণ হইয়াছেন, শেষ নরেন্দ্রের মধ্যেই নিজেকে দান করিয়া লীলা সংবরণ করিলেন। নরেন্দ্রের কণ্ঠে যে বিষাণ বাজিল, তাহার প্রতি বর্ণে হিন্দুধর্ম্মের মহিমাই ঘোষিত হইল,—হিন্দুত্বের



স্বামী ত্রিগুণাতীত।



স্বামী প্রেমানন্দ।

পুনঃ জাগরণে ঠাকুরেরই জয়মূর্ত্তি প্রকট হইল। ভারতের এই জাগরণমন্ত্রের ঋষি বিবেকানন্দ, আর দেবতা রামকৃষ্ণ—তাই বলি জয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ!

দক্ষিণেশ্বরে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হইল। ঠাকুরের গলরোগ হইলে, তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রথম কলিকাতার শ্যামবাজারে স্থানান্তরিত করা হয়, তারপর কাশীপুরের বাগানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এইখানে থাকিয়াই, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ বাকী রাখিয়াছিলেন, তাহা সমাপ্ত করেন, রোগের ভান করিয়া, গামছা নিংড়ান'র মত, তাঁর ভক্তদের জীবন মন্থন করিয়া খাঁটী ও বিশুদ্ধ করিয়া তুলেন।

নরেন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরের পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হইল, ততই তিনি অন্যান্য ভক্তদের সহিত একাত্ম হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কেন্দ্রকে ধরিয়া এক মণ্ডল প্রকাশ হইয়া পড়িল, ঠাকুর যেন চিদ্‌ঘন ভাগবতমূর্ত্তি, তাঁর সহিত প্রত্যেকের ভাগবত সম্বন্ধ :এবং প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের ভাগবত সম্বন্ধ দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহাই-ভাগবত মণ্ডলী সৃজনের সিদ্ধপথ, ইহাই

ব্রজ-মণ্ডল, বৃন্দাবনের রাসচক্র, ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের অমর অঙ্কুর।

নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার মত অনেকেই ঠাকুরকে ভগবানের চিদ্‌ঘন প্রকাশরূপেই সন্দর্শন করে, ইহার মর্ম্ম তিনি যত বুঝিলেন, ততই ঈশ্বরলাভের সহজ পথ-টার উপর শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। ঠাকুর যদি বলিতেন, "দেখ নরেন, এরা এবং অন্য অনেকে আমায় ভগবান মনে করে"—নরেন্দ্র সে কথার উত্তর দিতেন—"সবাই করুক, আমি যতদিন না তা অন্তরে অনুভব করি, ইহা স্বীকার করিব না।" ঠাকুর হাসিতেন, নরেন্দ্র যে চিত্ত দান করিয়া তৃপ্ত নয়, জীবনের সবখানি দিয়া ইহা বুঝিতে চায়! ঠাকুর অন্তরে অন্তরে নরেন্দ্রের সরল উত্তর শুনিয়া পরম পুলকিত হইতেন।

ঠাকুর শ্রীরাধার মধুর ভাবের সাধনতত্ত্ব শতমুখে বলিতেন, নরেন্দ্র তাহা শুনিতেন, প্রতিবাদ করিতেন, রাধা কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, ঠাকুর ছাড়িতেন না, বলিতেন—"ধর্ না, না হয় রাধা কল্পনায় আঁকা, কিন্তু যে সে ছবি এঁকেছে, তার-ভাবটা কত

গভীর! শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি তাঁর কি টান, স্বামী, পুত্র, কুল, শীল, জাতি, মান, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় সব ছেড়ে এমন উন্মাদনা না এলে কি ভগবান লাভ হয়?" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁর সমাধি হইত, নরেন্দ্র ইহার উপর কি বলিবেন, তিনি কেবল দেখিতেন —একাধারে বৈরাগ্যঘন, প্রেমঘন, ঠাকুর গুণময় ব্রহ্ম, মানব আকারে জীবের মুক্তি দিতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কাশীপুর

:*:-

নরেন্দ্রের চিত্তমন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, বুদ্ধির অহং তখনও ছিল, ঠাকুর তাই বলিতেন, 'নরেন যতই তর্ক করুক, সে হৃদয় ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে না।' সত্যই নরেন্দ্রের মত পুরুষসিংহকে ঠাকুর প্রেমের বাঁধন দিয়াই বাঁধিয়াছিলেন, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি কঠিন ক্ষুরধার, কিন্তু হৃদয়খানি ছিল কুসুমের মত কোমল, প্রভাত পদ্মের মত শুভ্র, পবিত্র, এই হৃদয় দিয়াই তিনি জগজ্জয় করিয়াছেন।

কাশীপুর বাগানে ঠাকুর আসিলে, নরেন্দ্র একপ্রকার বাড়ীছাড়া হইলেন, তরুণ ভক্তগণ ঠাকুরকে ঘিরিয়া ধরিলেন, রাখাল মহারাজ ছিলেন ঠাকুরের মানসপুত্র— তিনি আসিলেন, বাবুরাম, যোগীন, নিত্যনিরঞ্জন, শরৎ, শশী, হরি, গোপালদা, কালী, তারক, গদাধর, সারদা,



স্বামী নির্ম্মলানন্দ।



স্বামী যোগানন্দ।

লাটু, তুলসী, সুবোধ, এই ঘটনায় একপ্রকার বাড়ীছাড়া হইলেন। কাশীপুরে নূতন সংসার পত্তন হইল। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত শ্রীমা সন্তানদের মধ্যে থাকিয়া তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ দিয়া ইহাদের দিন দিন পুষ্ট করিতেন। ঠাকুর রোগশয্যায় পড়িয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্গ্রীব হইলেন। রোগ-যন্ত্রণা তিনি তুচ্ছ করিতেন। এতদিন ভাবের সাধনায় সন্তানেরা বিভোর ছিল, ক্রিয়াযোগে জীবনের অন্তর-বাহির স্তরে স্তরে নূতন করিয়া গড়িতে আরম্ভ করিলেন, কাশীপুর সাধনার ক্ষেত্র হইয়া উঠিল; শশী মহারাজ ঠাকুরের সেবায় দিবারাত্র নিমগ্ন থাকিয়া, শরীরের রক্ত-বিন্দু পর্য্যন্ত দিব্য করিয়া তুলিলেন, আর সব গুরু-ভ্রাতারা, ধ্যানযোগে, মন্ত্রযোগে, ঠাকুরের নির্দ্দেশমত বিবিধ সাধন সহায়ে দিব্য হইয়া উঠিলেন।

নরেন্দ্রের মধ্যে দিব্যশক্তি দিন দিন প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। কাশীপুরের বাগানে, নরেন্দ্র সকলের প্রাণস্বরূপ হইলেন, ঠাকুর বলিতেন, "নরেন, ভবিষ্যতে ইহাদের তোকেই চালাতে হবে।" নরেন্দ্র বলিতেন—

"আমি পারবো না;" ঠাকুর বলিতেন "মা তোকে জোর ক'রে ইহা করাবেন।"

কি এক তৃতীয় শক্তির পরশে নরেন্দ্র তখন উন্মাদ। দিবারাত্র ঈশ্বরসাধনায় কাশীপুরের বাগান পুণ্য-তীর্থে পরিণত হইল। এইখানেই রামকৃষ্ণ-সন্তানদের দিব্য-দর্শনাদি হইয়াছিল, নরেন্দ্র এই তপঃক্ষেত্রেই নির্ব্বিকল্প সমাধির আস্বাদ পাইয়াছিলেন, ঠাকুরের অহেতুকী করুণা অন্তরে অন্তরে মূর্ত্ত হইয়া সকলকেই নব-জন্ম দান করিয়াছিল। কামকাঞ্চনত্যাগী পরম সন্ন্যাসী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া, সকলকে নিত্য সন্ন্যাসের মন্ত্রে এইখানেই দীক্ষা দিয়াছিলেন। ভারতের ত্যাগ-মূর্ত্তি বুদ্ধের ধ্যান ও প্রসঙ্গ লইয়া এই সময় এত অধিক আলোচনা হইত, যে একদিন রাত্রে কাহাকেও না বলিয়া, স্বামীজী তারক ও কালীকে লইয়া, বুদ্ধগয়া প্রস্থান করেন; নরেন্দ্রনাথকে না দেখিয়া সকলে আকুল হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "কোথা যাবে সে, এখান ছেড়ে কোথাও সে শান্তি পাবে না—এমন মৌতাত কোথাও নেই।"স্বামীজীর উপর ঠাকুরের বাঁধন এমনই



স্বামী সুবোধানন্দ।



স্বামী শিবানন্দ।

দৃঢ় ছিল, যাহা কোনদিন খুলিবার নয়, নরেন্দ্রনাথও এই ঘটনায় তাহা অতি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন।

সারা পথ কেবল ঠাকুরের চিন্তা। কিন্তু বোধিবৃক্ষ-মূলে একবার উপবেশন করার ঝোঁক তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল; ঠাকুরকে অসুস্থ অবস্থায় রাখিয়া আসা হইয়াছে, অন্যান্য সকলে যে নরেন্দ্রের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে, সকল নির্দ্দেশ যে তাঁর নিকট হইতে না পাইলে তাহারা অচল হয়—এই সব বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহারা গয়ায় গিয়া উপস্থিত হন ও দুই ঘণ্টা গভীর ধ্যানের পর মন্দিরদর্শনে বাহির হইলে, স্বামীজী সহসা কাঁদিয়া উঠেন এবং তিন দিন গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

কাশীপুরে তাঁর ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায়, গুরুভ্রাতারা বড়ই উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া পড়েন; ঠাকুর তখন একটা গণ্ডী কাটিয়া বলিলেন, "আচ্ছা এই গণ্ডীর বাহিরে তার আর পা উঠ্‌বে না". এবং ইহার পরই নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কি আনন্দ! সকলে নরেন্দ্র-নাথকে আলিঙ্গন দিলেন, অনেকে নৃত্য করিতে লাগিলেন, পূর্ব্ব বন্ধন খসিয়া পড়িল, এই এক নূতন

বাঁধনে সবাই ধরা দিল, পূর্ব্ব সম্বন্ধ ঘুচিয়া নূতনতন সম্বন্ধে জাতিগঠন হইল।

ঠাকুরের দিন শেষ হইতেছিল, মহাসমাধির আর তিন চারি দিন মাত্র বাকী আছে, ঠাকুরের শীর্ণ শরীরে মৃত্যুর ছায়া ক্রমেই ঘন হইয়া আসিতেছে, নরেন্দ্রকে একদিন ডাকিয়া, দুয়ার বন্ধ করিতে বলিলেন ; সে মন্দিরে আর কেহ নাই, শুধু ঠাকুর আর নরেন্দ্র ; ঠাকুর করিলেন কি—জীবনের শেষ অমৃত-বিন্দুটী নরেন্দ্রের মধ্যে ঢালিলেন। নরেন্দ্র নয়ন উন্মীলিত করিতেই দেখিলেন, ঠাকুরের রোগক্লান্ত মলিন মুখখানি বহিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিতেছে, নরেন্দ্রের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, বুঝিলেন, সব শেষ হইল, আর বিলম্ব নাই, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের মত ঠাকুর এইবার নশ্বর ছায়াবরণ ত্যাগ করিবেন ; ঠাকুর বলিলেন—"নরেন! নরেন! আজ আমি সত্যই কাঙ্গাল, এক কড়া আর সম্বল নেই, সব দিলুম—এই দিব্যশক্তিবলে তোমা দ্বারা জগতে খুব বড় কাজ হবে, তারপর—কর্ম্মসমাপ্তির পর ফিরে যেও।"



স্বামী সারদানন্দ



স্বামী অভেদানন্দ

উভয়ের চক্ষে সে দিন যে অশ্রুপ্রবাহ বহিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধির বিষয়। নিত্য সঙ্গীকে শুধু কর্ম্মের জন্যই রাখিয়া ঠাকুর তখন জীবনের পারে চলিয়াছেন, ঐ বিরহ প্রিয়জনকে রাখিয়া বিদেশ গমনের চেয়ে কত ঘনীভূত ব্যথার কথা,তাহা ভাষায় বর্ণনা হয় না—শরীর থাকিতে মায়ার মর্য্যাদা রাখিতে হয়, ঠাকুর কাঁদিলেন, সে কান্নার মূল্য নাই!

দীপনির্ব্বাণের বিলম্ব নাই, প্রতি মুহূর্ত্তে শেষ হয়, এমনই ভাবে জীবনের ক্ষীণ কম্পন দেখা দিয়াছে, নরেন্দ্র নিজেকে গুছাইয়া লইতেছিলেন, একটা অনির্ব্বাণ প্রত্যয়ের হোমকুণ্ড বুকে না জ্বালিয়া ঠাকুরকে বিদায় দেওয়া যায় কি? একদিকে জীবনপ্রদীপ নিভিতে নিভিতে আবার জ্বলিয়া উঠে, অন্য দিকে জীবন প্রদীপ্ত করার আকুল উদ্যোগ, জ্বলিয়াও জ্বলে না, ঠাকুর কি ফাঁকি দিলেন? দীর্ঘ বিরহে জীবনের আগুণ যদি নিভিয়া যায়, কে আর ইন্ধন যোগাইবে রে! হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন। জীবন মরণের নিদারুণ সংগ্রাম চলিয়াছে, দৃঢ় শরীর আলিঙ্গনে ধরিয়া আছে জীবন,

মরণ আসিয়া নিষ্ঠুর আকর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে, ভয়ঙ্কর দেহের কাৎরানি—নরেন্দ্রের ভ্রূক্ষেপ নাই, অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“দোহাই ঠাকুর, এইবার একবার ব'লে যাও—তুমি আমার দেবতা, তুমি ভগবানের অবতার, আমার বিশ্বাস দৃঢ় হোক।” নরেন্দ্রের উপর সে দিন বিশ্বের কেন্দ্র-সত্য যে চাপিয়া বসিতেছিল, ঠাকুরের মৃত্যুব্যথায় তিনি তখন যত কাতর, তার চেয়ে নিজের দায়িত্বের বোঝা অধিক যন্ত্রণার কারণ হইয়াছিল। অভাব থাকিতে দুর্জ্জয় স্বভাব গড়ে না, নরেন্দ্র তাই ঠাকুরের মুখে সেই সত্যটা এই সাংঘাতিক সময়ে শুনিয়া লইতে চান, যে সত্য তাঁর জীবন মন্ত্র হইবে। সংশয়ের অগ্নিপরীক্ষায় ঠাকুরকে যাচাই করিয়াই, নরেন্দ্র বিশ্ব-জয়ে বাহির হইয়াছিলেন,তাই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি নরেন্দ্রের পদচুম্বন করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে পথ ছাড়িয়াছে। ঠাকুরের জীবন-দীপ এই কারণেই তখনও নিঃশেষ হয় নাই, পরমায়ুর ক্ষীণ সূত্রটুকু ধরিয়া তখনও ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল, হায় রে, বক্ষ বিদীর্ণ হয়, করুণাময়—বিশ্বকল্যাণের জন্য অকস্মাৎ মরণপীড়নে অবনতগ্রীবা,

অবসন্ন শক্তিধারাকে প্রাণপণে সমাহিত করিয়া নরেন্দ্রের দিকে ফিরাইয়া বিস্ফারিত নয়নে বলিলেন, "নরেন—এখনও অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ, এই আধারে সেই আমি রামকৃষ্ণ, এ তোর বেদান্তের বিচার নয়, বর্ণে বর্ণে সত্য।"

নরেন্দ্রের চক্ষে অশ্রু-উৎস উথলিয়া উঠিল—কিন্তু ঘরে তখন যেন একটা বিদ্যুৎ দেখা দিল, সমবেত ভক্ত-বৃন্দ বিস্ময়ে আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল, হরিষে বিষাদে রাত্রির আঁধার-অঞ্চলে প্রকৃতি ঠাকুরকে ঢাকা দিলেন—ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, ঠাকুর নশ্বর দেহ ছাড়িয়া শান্তি-রাজ্যে প্রস্থান করিলেন—সব ফুরাইল,আনন্দের হাট ভাঙ্গিল—ভারতের নবযুগ আরম্ভ হইল।

নবজীবন

—:*:—

ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর নরেন্দ্রের নূতন জীবন আরম্ভ হইল। ঠাকুরের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নরেন্দ্রনাথকে পাগল করিয়া তুলিল, কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের ভক্তগণ বাহির হইয়া একবার চিন্তা করিলেন, তাহাদের অতঃপর কি করিতে হইবে, কাম-কাঞ্চনত্যাগী শ্রীভগবান রামকৃষ্ণের অমর সত্তা তখন ইঁহাদের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, পুনরায় বাড়ী ফিরিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না, অথচ এতগুলি মানুষের ভরণ পোষণই বা হয় কি প্রকারে? সকলেই স্বামীজীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দক্ষিণেশ্বরে ভবিষ্যৎ-মূর্ত্তি কালগর্ভে তখন পুষ্ট হইতেছে, স্বামীজী তার সমগ্র রেখাচিত্র আপনার অন্তরে তখনও আঁকিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, ঠাকুরের



স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ।

গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন, ইহা কাহারও মনঃপুত হইল না, অবশেষে গৃহস্থ ভক্ত সুরেশ মিত্র বরাহনগরে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া উপস্থিত কয়েক জন ভক্তকে থাকিতে বলিলেন, এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানগণ তাহাদের অধ্যয়ন শেষ করিয়া এইখানেই ফিরিয়া আসিবে, ইহাই স্থির হইল। স্বয়ং স্বামীজী ইহাতে কোন আপত্তি তুলিলেন না, কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল।

কিন্তু স্বামীজী একটী নিঃশ্বাসও আর ঠাকুরের কাজ ভিন্ন অন্য কাজে দিতে সক্ষম হইলেন না; যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার জন্য বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বরাহনগরের মঠে ফিরিলেন—তপস্যার হোমকুণ্ড জ্বালিলেন, ঠাকুরের আত্মদান নরেন্দ্রের মধ্যে দিন দিন মূর্ত্ত হইতে লাগিল।

ঠাকুরের চিতাভস্ম লইয়া এই সময় গোল বাধিলে, নরেন্দ্রনাথ ইহা গৃহস্থভক্ত রামচন্দ্রকে ফিরিয়া দিতে বলেন, তিনি ঠাকুরের স্মৃতিচিহ্ন বুকে বহিয়া বাঁচার চেয়ে, তাঁর চরণতলে বসিয়া যে জীবন গড়িয়াছিলেন,

তাহা সার্থক করার দিকেই ষোল আনা ঝোঁক দিলেন। শশী মহারাজ নরেন্দ্রনাথের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না ; ভক্ত রামচন্দ্র ইহা লইয়া কাঁকুর-গাছি যোগোদ্যানে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, ইহাই ঠাকুরের সমাধিমন্দির।

শশী মহারাজ নরেন্দ্রের কথা রাখিলেন, কিন্তু চিতাভস্মের সবখানি দিলেন না। কিয়দংশ রাখিয়া দিলেন। স্বামীজীকে ইহা বলা হইলে তিনি হাসিয়া বলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছা!" সুরেশ মিত্র ইহাতে আপত্তি করেন, কেননা শীতলা ঠাকুরের মত, ঠাকুরকে লইয়া শাঁক ঘণ্টা বাজাইয়া পূজার আড়ম্বর তাঁহার তখন ভাল লাগে নাই, কিন্তু শশী মহারাজের একনিষ্ঠ ভক্তি দেখিয়া ইহার বিরুদ্ধে কেহই আর কথা বলিতে সাহস করেন নাই,—শশী মহারাজই মঠের মেরুদণ্ড ছিলেন, সকল সন্ন্যাসী ভক্তই ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রভাবে যে দিন ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়া যান, সে দিন শশী মহারাজই ঠাকুরের চিতাভস্ম বুকে করিয়া দিনের পর দিন গণিতে তাঁর চক্ষে ধক্ ধক্ করিয়া আগুণ জ্বলিত, উজ্জ্বল



স্বামীজীর ঘর (বেলুড়)।

ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে চিরদিনই মূর্ত্ত ছিল, তিনি অটল হিমাদ্রির মত স্থির ছিলেন, স্বয়ং স্বামীজীও তাঁহাকে টলাইতে পারেন নাই।

শিব-ও-সেবা এই দুই মহাভাব লইয়া মঠের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। স্বামীজী দিবারাত্র গুরুভ্রাতাদের লইয়া সাধন ভজন করিতেন। তাঁর কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিত "জয় রামকৃষ্ণ," আর বলিতেন "মানুষ গড়া হোক জীবনের লক্ষ্য, কি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়? ভগবান রামকৃষ্ণের মত এস আমরা ভাগবতময় হই, আত্ম-স্বরূপ লাভ করি—ঈশ্বরদর্শন করি।" কি তীব্র আকুলতা লইয়া এই সময় ঠাকুরের সন্ন্যাসিগণ যে মঠে বাস করিতেন, তাহা ব্যক্ত করার চেষ্টা ধৃষ্টতা—ঠাকুরের চাওয়া পূরণ করার যোগ্যতা লাভের এই আয়োজন সত্যই সমুদ্র-মন্থনে সুধা উৎপত্তির মত, কয়েকটী অনাঘ্রাত পবিত্র জীবন লইয়া ইহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা।

কিন্তু ঠাকুর যাহা চাহিয়াছিলেন—তা সার্থক করার মত নরেন্দ্রের আধার তখনও উপযোগী হয় নাই, ঠাকুরের ভাব পরিপাক করার জন্য এই সময় তিনি বন্য

কেশরীর মত ইতস্ততঃ চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেন। কখনও ধ্যান, কখনও "হর হর মহাদেব" ধ্বনি, কখনও বিলাপ, কখনও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঠাকুরের পুণ্যকাহিনী লইয়া আলোচনা অধ্যায়ন প্রভৃতি নানা কাজে জীবনের একটী নিঃশ্বাসও যাহাতে আত্মপ্রস্তুতির পথে ব্যর্থ না হয়, তাহার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। যে আবেগ লইয়া বরাহনগরের মঠে সন্ন্যাসীরা গিয়া একত্র হন, তাহা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল, এই সময় একটা অবসাদ আসিয়া সকলকেই আচ্ছন্ন করে। প্রথমেই সারদা মহারাজ কাহাকেও কিছু না বলিয়া মঠ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, তখন সকলের অন্তরেই পরিব্রাজকের ভাব আসিয়া শিকড় গাড়িয়াছে, স্বামীজীর অন্তরও যেন কি এক বৃহৎ ভবিষ্যৎকে ধারণ করার জন্য খালি হইয়া পড়িয়াছে। সারদা মহারাজের মঠ পরিত্যাগ ব্যাপার লইয়া তিনি প্রথমটা কিছু তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে চঞ্চল্যের বেগ তখন দেখা দিয়াছিল, তিনি বুঝিলেন তাহা রোধ করা সাধ্যে কুলাইবে না,—তিনি প্রভুর হাতে সব

ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ফলে দাঁড়াইল, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সকলেই মঠের বাহির হইয়া পড়িলেন, সেইদিন গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দক্ষিণেশ্বর ভারতজয়ে সত্যই বাহির হইল, স্বামীজীও পরিব্রাজক বেশে সকলের অনুসরণ করিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। স্বামীজী শেষে একাই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিলেন।

নরেন্দ্রের প্রকৃতি ঠাকুরের প্রকৃতি হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র ছিল, শুধু স্বতন্ত্র নয় বিরোধী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—ঠাকুর তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া আপনাকে তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন—স্বামীজী তাই ভবিষ্যতে বলিতেন, "কালী আমায় ভৃত্য করিয়াছে!" এই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তত্ত্বটা সংশয়রূপে দেখা দিত, ঠাকুরের কাঞ্চন-স্পর্শে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হইত, তাহা পরীক্ষার জন্য অতর্কিতে শয্যাতলে রজতমুদ্রা রাখিয়া দিতেন, শ্রীমার সহিত রাত্রি যাপন কালে, ঠাকুরের গৃহপার্শ্বে নরেন্দ্র

আড়ি পাতিয়া থাকিতেন, এমন কি মরণযন্ত্রণাকাতর ঠাকুরের কানের কাছে গিয়াও তিনি সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেদিন জড় মনের জাল ছিঁড়িয়াছিল, অধ্যাত্ম জগতের দুয়ার তাঁর কাছে মুক্ত হইয়াছিল, একটা নূতন শক্তি তাঁহাকে সেদিন উন্মাদ করিয়াছিল—কিন্তু উৎসর্গ-যজ্ঞের ইহাই সবখানি নয়, ঠাকুরের তিরোধানের পর যে বিপদ নরেন্দ্রকে ঘিরিয়াছিল, তাহা ভারত ভ্রমণকালে, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের সম্মুখে আত্মদানের চেয়েও অধিক। তিনি দুর্গম পর্ব্বতশৃঙ্গে, ভয়ঙ্কর অরণ্যে, সমুদ্রতটে বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, অনাহারে তাঁর প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, কিন্তু এই সকল সেই মহাবিপদের তুলনায় তুচ্ছ, সে বিপদ হইতে যদি ত্রাণ না পাইতেন, দক্ষিণেশ্বর আজ অতল বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইত।

ঠাকুরের জীবনকালেই, পাওহারী বাবার প্রতি তাঁর মনে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, পাওহারী বাবা ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মান্য করিতেন, ঠাকুরের ছবি দেখাইয়া তিনি অশেষ শ্রদ্ধার ভাব

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ঠাকুরের জাগ্রত প্রেমে সেদিন নরেন্দ্রের হৃদয় পূর্ণ ছিল, তাই সেদিন ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু আজ আবার সেই জন্মগত সংশয় ভীমবেশে দেখা দিল। ঠাকুরের প্রত্যক্ষ ধর্ম্মবল সঞ্চারে জীবন যেমন তাজা ও সরল ছিল, তাহা আত্মস্থ করার কঠোর তপস্যায় অন্তর মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না, একদিকে অধ্যাত্ম অহঙ্কার আত্মস্বরূপ প্রকাশের জন্য উদ্যত, অন্য দিকে মহাকালী স্বকার্য্যসাধনে এই বীরেন্দ্রকেশরীর পৃষ্ঠে স্থিরাসন প্রতিষ্ঠায় যত্নময়ী, এই মহা দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, এক প্রকার স্থির করিয়াই ফেলিলেন—যে, দক্ষিণেশ্বরে যে সাধনা পাইয়াছি তাহা আমায় পূর্ণ সিদ্ধি দেয় নাই, জীবনে অখণ্ড শান্তির প্রতিষ্ঠা করে নাই, যোগসিদ্ধ পাওহারী বাবাই আমার উপযুক্ত গুরু—তিনি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

নরেন্দ্র সেদিন ভুলিয়াছিলেন ঠাকুরের উপদেশবাণী, নির্ব্বিকল্প সমাধির চাবী যে তিনি ঠাকুরের চরণে দান

করিয়া কাঙাল হইয়াছেন, ঠাকুরের মহাবাণী প্রচারের অপরাজেয় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তো তাঁর এই পরিব্রজ্যা. কাজ শেষ হইলেই যে ফেরার অনুরোধ বড় মর্ম্মান্তিক ব্যথায় ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাসের সহিত নরেন্দ্রের কানে কানে কহিয়া গেলেন, কেন তবে আজ এত অভিমান. ঠাকুরের স্পর্শে যে কত ঘোর পাপী মুক্তি পাইয়াছে, সমাধি লাভ করিয়াছে, নরেন্দ্র কি তাহা জানেন না; তিনি নিজেই যে মরণের পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে তাঁর খুল্লতাত-ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর একে ছুঁয়ে দাও, মুক্তি পাক্" —ঠাকুর বলিলেন, "আমি মর্‌তে বসেছি; এখন আর জ্বালাস্ নি"—নরেন্দ্র সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, দয়ার ঠাকুর অগত্যা তার বক্ষস্থল অঙ্গুলী দিয়া স্পর্শ করিলেন, তিনি সমাধিস্থ হইলেন, এ কথা কি আজ আর মনে পড়িল না? মার যখন আসে, তখন সে দুর্জ্জয় বেশেই দেখা দেয়, নরেন্দ্র একুশ দিন এইরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া, পরিশেষে, পাওহারী বাবার নিকট দীক্ষা লইতে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু একি ইন্দ্রজাল! পা চলে না কেন! শরীর

যেন পাথরের মত ভারী হইল, জগতের ব্যথা আসিয়া হৃদয় অবসন্ন করিল, কোথায় কে কাঁদিয়া আকুল হইল রে, যার বেদনার অশ্রু আসিয়া আমায় ভাসাইয়া দেয়? স্বামীজী তবুও প্রশ্ন করিলেন, 'না-না---কে আমার গুরু, কে আমার কাণ্ডারী—রামকৃষ্ণ, না পাওহারী বাবা!" চক্ষু অশ্রুসিক্ত, দৃষ্টি ঝাপ্‌সা—সহসা জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল প্রকাশ হইল। হায় অবিশ্বাস, এত ক্ষুদ্র তুমি, পলাইতে পথ পাইল না, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর জ্ঞান-শক্তি-প্রেমের চিদ্‌ঘন মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন—এতদিনে অধ্যাত্ম চেতনার স্তর হইতে সংশয়ের লৌহ নিগড় খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, "হায় অকৃতজ্ঞ,এ কি তোমার আচরণ!" নরেন্দ্রের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিল "জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!! আর কেহ নহে, প্রভু, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—রামকৃষ্ণ,রামকৃষ্ণ!" নবমন্ত্রে নরেন্দ্রের দীক্ষাহইল, —নবযুগের রুদ্ধ দুয়ার দেববালারা মুক্ত করিয়া দিল— শত শত বৎসরের ঘন তমিস্রা বিদীর্ণ করিয়া,তরুণ সূর্য্যের রক্ত আভায় হিমালয়ের উন্নত শির রাঙা হইয়া উঠিল— ভারতের ঘরে ঘরে নবশঙ্খ বাজিল—নবযুগের সূচনায়।

মঠ ছাড়িবার সময় শ্রীমা যখন বলিলেন, "একবার বাড়ী যাবে না, মাকে দেখ্‌তে ?" স্বামীজী বলিলেন, "তুমিই আমার মা, একমাত্র আরাধ্য"—অধ্যাত্ম জীবনের এই নবপ্রসূতির চরণে প্রণাম করিলে, তাঁর পুণ্য আশীর্ব্বাদের সঙ্গে এই কথাটা স্বামীজীর কাণে গিয়াছিল "এসো, এসো।" সে ডাক তাঁর মনে বড় গভীর দাগ কাটিয়াছিল—তিনি নিত্য ভাবিতেন দক্ষিণেশ্বরের কথা, কাশীপুরের বাগান, বরাহনগরের মঠ। বলরাম বাবুর মৃত্যুতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। একজন বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসীর শোক করিতে নাই।" স্বামীজী সিংহগ্রীবা বাঁকাইয়া বলিলেন, "কি বল ? সন্ন্যাসী কি মানুষ নয় ! তার হৃদয় কি পাথরের মত ঠাণ্ডা ? গৃহীর চেয়ে সন্ন্যাসীর হৃদয় অধিক অনুভূতিময়।" আসল কথা ; ঠাকুরের মণ্ডল ছিল তাঁর জীবনের অবিভাজ্য অঙ্গ, তাঁর পবিত্র চরণতলে বসিয়া যারা দীক্ষা লইয়াছিল, তাহাদের সহিত ছিল তাঁর অভিন্ন পরিচয়, কিছুদিন পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিলেন,



শ্রীমা।

আবার বলরাম বাবুর মৃত্যু সংবাদে তিনি কাতর হইলেন।

কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, অযোধ্যা. ভারতের সকল তীর্থ পর্য্যটন করিলেন, আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ করিয়া বুঝিলেন, অখণ্ড ভারত জগতের তীর্থ, কাশ্মীর ও নেপাল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, এবং আসাম হইতে বম্বে, সর্ব্বত্রই ভারতের পুণ্য কীর্ত্তি দেদীপ্যমান, নেপালের পশুপতি নাথ,তারকেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি, কাশী, রামেশ্বর, সর্ব্বত্র এক দেবতারই পূজার আয়োজন, এই তেত্রিশ কোটী নরনারীর মিলন-মন্ত্র ধর্ম্মসাধনার মধ্যেই নিহিত।

তিনি হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে অসংখ্য সাধুর আশ্রম-ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিলেন, ভারতের সকল তীর্থরেণু মাথায় তুলিয়া লইলেন, দেশীয় রাজ্যগুলির পরিচয় গ্রহণ করিলেন। শেষে ভারতের প্রান্তদেশ কুমারিকায় আসিয়া দণ্ডকমণ্ডলুধারী পরিব্রাজক, মুণ্ডিত মস্তক, উন্নত বক্ষ, ভারতের মূর্ত্ত দেবতা দৃঢ়পদে দাড়াইলেন— সম্মুখে নীল সাগরতরঙ্গ অনন্তের কোলে গিয়া

মিশিয়াছে, আর একবার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বিশাল ভারত, কোটী কোটী নর-নারীর আবাসভূমি, নদ-নদী-ভূধরবেষ্টিত পুণ্য-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ —হায় মা, বালুকণার মত ক্ষুদ্র আমি, তোমার কি কাজে লাগিব! স্বামীজী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সমুদ্রতটে বালুভূমির উপর ক্লান্ত শরীর এলাইয়া উপবেশন করিলেন।

আজ তাঁর চিত্তে অখণ্ড ভারত মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল। তিনি মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, বঙ্গ, উড়িষ্যার চিত্র দেখিলেন না, তিনি কাণ পাতিয়া শুনিলেন—এখনও ঋষির কণ্ঠে বেদের ঝঙ্কার স্তব্ধ হয় নাই, ষড়দর্শনের যুগে ভারতের তপঃক্ষেত্রে সত্যের সন্ধানে উদ্যত মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ন্যায়-স্মৃতির শাসনদণ্ড হস্তে, জাতির আচার রক্ষণে যত্নশীল, কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য রব অনাহত, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, কবির, রামদাস, চৈতন্য. ভারতের ধর্ম্মবিগ্রহগুলি সব যেন জীবন্ত, ভারত ধর্ম্মের জয়চ্ছত্র উড়াইয়া জগৎকে দীক্ষা দিতে অভিযান করিতে চায়, কিন্তু ধ্বজদণ্ড ধরার যোগ্যতা বর্ত্তমান



পরিব্রাজক বিবেকানন্দ।

যুগে ভারতবাসীর নাই দেখিয়া ভারত-সত্তা ক্ষুব্ধ বিষণ্ন। লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী নানাভাবে সাধনরত, কেহ কেহ বা ধর্ম্মোপদেশে জাতির প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের অধিকাংশ প্রাণই নির্জ্জীব, ব্যথায় যেন অবসন্ন, কোথাও উপেক্ষা, কোথাও দারিদ্র্য অধিকাংশ জীবনকে পঙ্গু করিয়াছে, ভারতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে, তাহাকে উঠিতে হইলে প্রাণের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে, ধর্ম্ম এ জাতির সিদ্ধ সম্পাদ।

স্বামীজী এক দণ্ডে স্থির করিলেন---এই পতিত জাতির মুক্তি উপস্থিত নির্ভর করিতেছে, ধর্ম্মে নয়, অন্নে, ইহাদের স্বাবলম্বী করার শিক্ষাই এক্ষণে প্রয়োজন, যদি প্রাণ পায়, ধর্ম্ম লাভ সহজেই হইবে, ইহার উপায়,---চাই মানুষ আর চাই অর্থ।

কাঙ্গাল স্বামীজী—এই বিপুল দেশের প্রাণশক্তিকে জাগাইবার যে বিপুল আয়োজন, তাহার পক্ষে তাঁর সামর্থ্য আর কতটুকু, কিন্তু চক্ষে তাঁর আগুণ জ্বলিল, ভাবিলেন—যদি গুরু কৃপা করেন, আমিই এ কাজ

করিব ; তাঁর কণ্ঠে এই সময়েই এই মহাবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—বার বার জন্ম গ্রহণ করিব, অশেষ দুঃখ মাথা পাতিয়া বহিব, মূর্খ ভগবান, পাপী ভগবান, দরিদ্র ভগবানের সেবা করিয়া এই পতিত জাতির উদ্ধার সাধনই হইবে আমার ব্রত। এইখানেই ঠাকুরের কাজ প্রকট মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "For the sake of the Dharma, for the sake of India's poor, for the sake of the very life and soul of India, I would go to the West in order that means and ways might be found for the raising of the Indian masses and for the recognition amongst the nations of the value of the Indian experience."

এই মহাভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি মাদ্রাজে আসিলেন, গুজরাট ভ্রমণকালে পোড়োবন্দরে জনৈক পণ্ডিত প্রথম স্বামীজীকে আমেরিকায় গিয়া ধর্ম্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ করেন, তারপর চিকাগোয় ধর্ম্ম-কংগ্রেসে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিনিধি হইয়া যাওয়ার সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া তিনি শ্রীমাকে পত্র দিলেন, শ্রীমা কোন আপত্তি করিলেন না, তাঁর সম্মতিসূচক উত্তর পাইয়া তিনি উন্মাদ হইলেন।

মাদ্রাজের ভক্তগণ ও দেশীয় রাজ্যের কয়েকজন অধিপতি স্বামীজীর এই কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি ২০ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতের উপকূল ছাড়িয়া ঠাকুরের বাণী প্রচারের জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন—দক্ষিণেশ্বরের শক্তিপ্রচারের ইহাই সন্ধিক্ষণ।

দিগ্বিজয়

—ঃ*ঃ—

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো সহরে ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হয়। স্বামীজী কিছু পূর্ব্বে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে দুঃখ পাইতে হইয়াছিল অনেক, কিন্তু তাঁর অন্তরে যে দাবানল তখন জ্বলিতেছিল, তাহাতে সকল কিছুই পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন শুনিলেন, চিকাগো ধর্ম্মসভায় প্রবেশ করার যে নিয়ম তাহা তিনি যথারীতি পালন করেন নাই, ভারতের কোন সভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া তিনি নির্ব্বাচিত হন নাই, অতএব তাঁর সভার কার্য্যে যোগদান সম্ভব নহে, তখন সত্যই একটী মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর হৃদয় ব্যথার শিহরণে দুলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, আমেরিকার কয়েকটী ভদ্রপরিবার স্বামীজীর উপর বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। অধ্যাপক রাইট

নামে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বামীজীকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, যে তাঁর সহিত ধর্ম্মসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির যথেষ্ট পরিচয় আছে, তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া সভায় যাহাতে তিনি প্রতিনিধিরূপে স্থান পান তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যথা সময়ে তিনি এই মর্ম্মে একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া স্বামীজীর হাতে দিলেন —কিন্তু অশেষ দুঃখের তরঙ্গ ভেদ করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে হইয়াছে, চিকাগো সহরে আসিয়া পত্রখানি তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। তখন রাত্রিকাল। প্রভাত হইলেই সভার কাজ আরম্ভ হইবে, অথচ এই বিরাট সহরে তাঁর আর দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত পরিচয় নাই, কাজেই একান্ত নিরুপায় হইয়াই, রেলওয়ের মালঘরের পাশে রাত্রি যাপনের জন্য শয়ন করিলেন। সারা রাত্রি কাটিল, ভারতে পর্য্যটনকালে এমন করিয়াই তো বৃক্ষতলে পড়িয়া তাঁহাকে রাত্রি কাটাইতে হইত— ভারতের সুখ-স্মৃতি এত দুঃখেও সান্ত্বনা দিল। স্বামীজীর মুখে ভারতের নাম বড় মিঠা শুনাইত, তাঁর ভক্ত নিবেদিতা তাঁর এই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিতে গিয়া

ভারতবাসীকে বলিয়াছেন, যে "ভারত ভারত" এই মন্ত্র প্রতিদিন তাহাদের কয়েক বার উচ্চারণ করা উচিত।

নিদ্রান্তে নিশ্চিন্ত হইয়া, প্রভাতের আলোয় সম্মুখের জল-কলে হস্ত মুখ ধৌত করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় সম্মুখের প্রাসাদ হইতে একজন অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী বাহির হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি বুঝি ধর্ম্ম-সভার প্রতিনিধি!" বীণার মূর্চ্ছনার মত এ মিষ্ট স্বর স্বামীজীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল, তিনি নিজের দুর্দ্দশার কথা বলিলেন, যুবতীর হৃদয় দ্রব হইল, তিনি বলিলেন, "আপনি আসুন—প্রাত-র্ভোজন শেষ করুন, আমি আপনাকে পার্লামেন্টের অফিশে নিয়ে যাব।" স্বামীজীর হৃদয় নব উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠিল, কে বুঝিবে—ভাগ্যাকাশ প্রতিবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার পরই যখন নূতন আলোকে জীবন উদ্ভাসিত হয়,তখনকার করুণামূর্ত্তি তাঁকে উন্মাদ করে, তাঁর চক্ষে যে আনন্দের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, সে দৃষ্টি তখন কি এক মুহূর্ত্তে দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর, বরাহনগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল না? স্বামীজীর দৃষ্টি স্থান কাল ভেদ করিয়া, এই দূর-

দেশে থাকিয়াও তাঁর ব্রজমণ্ডলের সহিত নিজেকে সতত যুক্ত দেখিত, এই রহস্যই তো বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণের বৈদ্যুতিক চক্রের মূর্ত্তরূপ গড়িয়া তুলিল।

সেদিন সোমবার আমেরিকার সম্ভ্রান্ত নর নারী জগতের সর্ব্বত্র হইতে নানা ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের মুখে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মর্ম্মকথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে, সভাপতি একে একে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে যেমন আহ্বান করেন, সেইরূপ স্বামীজীকেও বার বার আহ্বান করিলেন, তিনি প্রতিবারেই "না, এখন না" বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সভাপতি এক প্রকার বিরক্ত হইয়াই ভাবিলেন, লোকটার আদৌ কিছু বলিবার আছে তো! প্রায় ২০ জন প্রতিনিধির বক্তৃতা শেষ হইলে, অপরাহ্নে স্বামী বক্তৃতামঞ্চে গিয়া দাঁড়াইলেন। গৈরিক-বস্ত্র-শোভিত বীরবপু, মস্তকে গৈরিক উষ্ণীষ, বিস্ফারিত নয়ন, বিশাল বক্ষ, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সভাক্ষেত্র উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, স্বামীজীর কণ্ঠে কি সুমধুর স্বরে উচ্চারিত হইল—"ভাইগণ, ভগ্নিগণ"—

এমন সম্বোধন আর কেহ করে নাই, এমন নিবিড় আত্মীয়তার স্নেহবিগলিত স্বরে আর কেহ কথা বলে নাই, প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ভাবের বন্যা উথলিয়া উঠিল, সেদিন দক্ষিণেশ্বরের সবখানি প্রেম ঘনীভূত হইয়া নরেন্দ্রের চক্ষে বুঝি কাজল পরাইয়া দিয়াছিল, দক্ষিণেশ্বরের অমিয় কণ্ঠ অবিকল তাঁর প্রতি বাণীতে ঝঙ্কার তুলিতেছিল, বিশাল সভাগৃহ নিস্তব্ধ, প্রত্যেক নরনারী যেন স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতে লাগিল—সে তো কথা নয়, যুক্তি নয়, ধর্ম্মের গরিমা নয়, সে একটা ঝঙ্কার, বাণী যেন বীণা বাজাইয়া সকলকে মোহিত করিল। ধর্ম্মসভা সাঙ্গ হইল—স্বামীজীকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, সে সকল কথার বিশদ বিবরণ দেওয়ার স্থান আমাদের নাই।

স্বামীজী আমেরিকায় ও লণ্ডনে প্রচার করিলেন—যে ভারত ধর্ম্মের কাঙাল নহে। ত্রিশকোটী নর-নারীসেবিত ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরায় প্রাচ্যের ধারণা জন্মিয়াছিল, যে ভারতবাসী শিক্ষার অভাবে ভ্রান্ত, আত্মচেতনাবিহীন, একটা বুনো জাতি,

তাই ইহাঁদের উন্নতিকামনায়, আমেরিকা ও লণ্ডনের সহৃদয় নরনারী ভারতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। স্বার্থলোলুপ খৃষ্ট মিশনারীগণ তাঁহাদের এই ধারণা আরও সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছিল। স্বামীজীর অভ্যুত্থানে, ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশনারীগণের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে লাগিল, তাহারা স্বামীজীর উপর খড়্গহস্ত হইলেন, তাঁর প্রতি জঘন্য আচরণ করিতে কুণ্ঠা করিলেন না, স্বামীজীর অকলঙ্ক চরিত্রে দোষারোপ করিয়া আমেরিকাবাসীর মনে অশ্রদ্ধা সঞ্চারের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি রাহু-মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় আরও উজ্জ্বল ও শুভ্র মূর্ত্তিতে সকলের অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁর অপরাজেয় চরিত্রবল ক্ষুণ্ন করার সাধ্য কাহারও ছিল না।

স্বামীজী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন, আমেরিকায় ভারতধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হন, এইখানেই মিস্ মারগারেট নোবল নাম্নী ইংরাজ মহিলা, যাঁর পুণ্যস্মৃতি ভারতের ঘরে ঘরে আজ রেখাপাত

করিয়াছে, সেই স্বামীজীর চরণে উৎসর্গীকৃত ভগ্নী নিবেদিতার সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতা শিক্ষা-কার্য্যে জীবন ঢালিয়াছিলেন, তাঁর নিজের হাতে-গড়া কোন এক বিদ্যালয়ের তিনি সর্ব্বপ্রধান কর্ত্রী ছিলেন, স্বামীজী লণ্ডনে আসিয়া বেদান্ত প্রচার আরম্ভ করিলে, ইনি ইহাতে আকৃষ্ট হন। প্রথম প্রথম স্বামীজীর বাণী আত্মজীবনের আকাঙ্খার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া তিনি বোধ করেন নাই, কিন্তু প্রতিদিনের কথাগুলি তাঁর জীবনের গভীরতর স্তরে বিপ্লব বাধাইত, তিনি নিজের আদর্শের সহিত স্বামীজীর উপদেশ ওজন করিয়া দেখিতেন। স্বামীজীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এই মহিলার ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল, তিনি বুঝিয়াছিলেন—ইনি যখন তাঁর মর্ম্মকথা স্বীকার করিবেন, সে স্বীকার তাঁর জীবনের সবখানিকে উল্টাইয়া দিবে,—স্বামীজীর এই ধারণা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। নিবেদিতার আত্মদান স্বামীজীর জীবনে একটা যুগান্তর আনিয়াছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিলন-তত্ত্বের মত ইহাও অপূর্ব্ব রহস্যময়।

স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ যখন আমেরিকার কাগজপত্রে প্রকাশ হইতেছিল, তখন ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের নাম প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। সে যুগে হিন্দু-ধর্ম্মের এই গৌরব মুমূর্ষু হিন্দুর প্রাণে অমৃতের পরশ দিয়াছিল, বিশেষতঃ স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণ যখন শুনিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ অন্য কেহ নহেন, তাঁহাদেরই নরেন্দ্র, তখন আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহাদের মনে পড়িল—ঠাকুর বলিতেন, "নরেন পৃথিবী কাঁপিয়ে দেবে"—আজ সে বাণী সত্য হইল। ঠাকুরের এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন করিয়া সার্থক হইবে, এ কল্পনা কাহারও ছিল না, হর্ষে, বিস্ময়ে সকলেই অভিভূত হইলেন।

স্বামীজী যখন লণ্ডন ছাড়িয়া, ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন একজন ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, এই শক্তি ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি প্রতীচ্য দেশে এতদিন বাস করার পর, ভারতবর্ষ আপনার কেমন লাগ্‌বে!" স্বামীজী সগর্ব্বে

উত্তর দিয়াছিলেন, "ভারত আমার চির-প্রিয়, আজ এই দীর্ঘ বিরহে মনে হয়, ভারতের প্রতি ধুলিকণা পবিত্র, ভারতের বায়ু পবিত্র, ভারত পুণ্যভূমি, তীর্থ-ক্ষেত্র।" ভারতের প্রতি এত প্রীতি ছিল বলিয়াই, তিনি ভারতের দাবী জগতের দরবারে উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন, আর সে দাবী কেহ উপেক্ষা করিতে পারে নাই।

সিংহল হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত সে দিন উৎসবের ধূম পড়িয়াছিল, ভারতজননী স্বর্ণ অঞ্চল বিছাইয়া এই বিজয়ী বীরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করেন,—ভারতের ধর্ম্ম সে দিন জয়মাল্য গলে দুলাইয়াছে, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে ভারত জয়মুকুট মাথায় পরিয়াছে।

স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হইলেন, অধ্যাত্ম রাজ্য জয় করিয়া তিনি সমাজ-জীবনের মুক্ত ও সচ্ছন্দ মূর্ত্তি গড়ায় প্রাণ দিতে উদ্যত হইলেন, ইহাই তাঁর নবযুগের কাজ, তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতীচ্য ভারতের তুলনায় ধর্ম্মক্ষেত্রে

খুবই নগণ্য, কিন্তু তাহাদের সমাজজীবন, ব্যবহারিক জীবন ভারতের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ ও উন্নত, ভারতকে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। এই হেতু নূতন ভারত গড়ার জন্য তিনি যে বাণী উচ্চারণ করিলেন ও যে কার্য্যে প্রাণ ঢালিলেন, তাহা অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মীর নিকট দুর্ব্বোধ্য, বরং বিপরীত বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। কেহ যদি তাঁহাকে আসিয়া বলিত, "স্বামীজী জপ ধ্যান করি, ঘরের দোর বন্ধ ক'রে চক্ষু বুজে বসি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে কিন্তু শান্তি তো পাই না!" স্বামীজী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেন, "কথা শোন, দোর খুলে, চক্ষু চেয়ে দেখ— হাজার হাজার লোক না খেয়ে মর্‌ছে, ঔষধ পথ্য অভাবে পরিত্রাহি চীৎকার কর্‌ছে, জ্ঞানহীন দরিদ্র ভাই বোন, তাদের মুখে অন্ন তুলে দাও, রোগ শয্যায় ব'সে, তাদের সেবা কর, শিক্ষার বাতি জাল, শান্তি পাবে।" এইরূপ কথা শুনিয়া যদি কেহ বলিত, "স্বামীজী এই সব তো মায়া, পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়লে বেদান্তের কথামত মুক্তি আস্‌বে কি?" স্বামীজী এক মুহূর্ত্ত উত্তর দিতে অপেক্ষা করিতেন না; বলিতেন, "মুক্তির কল্পনাও কি

মায়া নয়, বেদান্তে কি আত্মা নিত্য-মুক্ত এ কথা বলে না! মুক্তির জন্য এত আগ্রহ মায়ারই লক্ষণ।" গোমাতারক্ষিণী সভার সদস্যগণের কথার উত্তরে স্বামীজী যখন বলিলেন, "বুঝিয়াছি—গরুই তোমাদের জননী, তা না হলে এমন বুদ্ধিমান সন্তান জন্মায়!" তখনই বোঝা গেল, ভারতের প্রাণশক্তি অনর্থক কর্ম্মে যাহাতে ব্যয় না হইয়া জাতিকে জাগাইয়া তুলে, তাহার জন্য কিরূপ আকুল হইয়াছিলেন। তিনি মুক্তি মোক্ষ, শান্তি সিদ্ধির কথায় বড় কঠোর বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন—"এই সব তাদের কথা—যাদের বুকের আগুণ নিভে যাচ্ছে—মুক্তি মোক্ষ শান্তি সিদ্ধি এ সব তোদের ভাব্‌তে হবে না, আত্মা চাইছে প্রকাশ, শক্তির সাধনা কর—সব দিক দিয়ে সম্মোহন তোদের ঘিরে ধরেছে; তোদের কিছু নেই—এই সম্মোহনই মারাত্মক, আমিও তো এই দেশের হাওয়া বাতাসে মানুষ, আমি নিজেকে কিছুর অভাবে, দুর্ব্বল ব'লে ভাব্‌তে পারি না, এই কথাটাই শুধু প্রচার কর, আত্মসাধনার নেশা ছেড়ে দে, ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার কর, উঠ জাগ, দেবত্ব

আমাদের সিদ্ধ সম্পদ, অভাব নেই, দুঃখ নেই, বিশ্বাস কর, সত্য প্রকাশ হবে,”—কথা তো নয়, আগুন, গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত এ কেমন সন্ন্যাসী—যার কাছে শান্তির বাণী নাই, যে জাগরণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া প্রাণ মাতায়, হৃদয় উদ্বুদ্ধ করে, এই অনির্ব্বাণ আগুণের এক কণাও যদি কেহ ধরিয়া থাকে, শান্তি-রাজ্যের সেই তো সম্রাট্—স্বামীজী ভারতে হিন্দুধর্ম্মের বৈদ্যুতিক প্রেরণা ছড়াইতে লাগিলেন।

স্বামীজীর মঠ-প্রতিষ্ঠার মূলে এই বৈদ্যুতিক প্রেরণাই মূর্ত্ত হইয়াছিল। তাঁর গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে এতদিন যে তপস্যা, যে সাধনা আত্মমুক্তিলাভের ও পরমাত্মা-সাক্ষাৎকারের জন্যই প্রযুজ্য হইয়াছিল, তাহা তিনি ঘুরাইয়া জাতির মুক্তি সিদ্ধির জন্য নিয়ন্ত্রিত করিলেন, যে শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনা ব্যক্তিগত জীবনের জন্য এতদিন আটক ছিল, তাহা মানবের কল্যাণের মুক্ত ধারা রূপে প্রবাহিত হইল, মঠ ইহার উৎস-মূল। তাঁর নিজের কথাতেই বলি:—The mission of his life was to create a new order of sannyasins in India,

who would fling away their own *mukti* and would go to hell, if indeed in order to be of help and service to others." এই মহাবাণীর পশ্চাতে, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মত ঠাকুরের প্রতি তাঁর অকপট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের নিদর্শনই দেখিতে পাই, তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের অনুগ্রহ পেয়ে যে এখনও আত্মমুক্তির সাধনা করে, সে অন্ধ, স্বার্থপর। আমাদের কাজ দেশকে জাতিকে জাগিয়ে তোলা, মানুষের হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠা করা।"

মঠের উদ্দেশ্য তিনি এই মর্ম্মেই ব্যক্ত করিয়াছেন—তাঁর সমস্ত জীবন ছানিয়া যাহা গড়িয়া উঠিল, তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের নিত্য স্মরণ রাখা উচিত—তিনি চাহিয়াছিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কার্য্যে ও কথায় যে সত্য প্রকাশ হইয়াছিল, তদনুযায়ী মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন জীবন যাহাতে গড়িয়া উঠে তাহারই ব্যবস্থা, একই সনাতন ধর্ম্মের বিভিন্ন ধারাগুলির সহিত সামঞ্জস্য ও পরিচয়, মঠে এমন মানুষ গড়িয়া উঠিবে, যাঁহারা জনসাধারণের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের জন্য, শিক্ষা-

প্রচার কার্য্যে আত্মদান করিবেন, ঠাকুরের জীবনপরিচয় সম্যক্ রূপে দেশের নিকট উপস্থিত করার জন্য, বেদান্ত ধর্ম্মের প্রচার—দেশের সর্ব্বত্র মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা, যেখান হইতে গৃহী ও সন্ন্যাসীগণ উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষা ও সাধনার কথা প্রচার করিবে—ভারতের বাহিরেও ধর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া, জগতের সহিত ভারতের নিত্য পরিচয়ের ব্যবস্থা। তাঁর মিশন ছিল, ধর্ম্ম ও মানব-কল্যাণ। রাষ্ট্রচর্চ্চার স্থান ইহার মধ্যে রাখেন নাই।

স্বামীজী যে অধ্যাত্ম শিক্ষা দক্ষিণেশ্বরে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার উপর ভর করিয়া পরিব্রাজক জীবনে যে দিব্য জাতীয়তার অনুভূতি তাঁহার মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, যে তপস্যার বলে, তিনি চিকাগোর ধর্ম্ম-সভায় মূর্ত্তিমান ভারত বেশে জয়-কেতন উড়াইলেন, সেই শিক্ষা, অনুভূতি, তপস্যা দিয়া জাতীয় জীবন গড়ার জন্যই বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর চরিত্র কেমন করিয়া এমন দিব্য. বৈদ্যুতিক তেজঃ-পূর্ণ হইল, ইহার অনুসন্ধান করার পথও তিনি

যাহাতে জটিল না হইয়া উঠে, নানা কথায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, জীবনের যোগ সাধন করিতেই যদি ভারতের তরুণ যৌবন-যুগ কাটাইয়া বার্দ্ধক্যের ছায়াতলে আসিয়া পড়ে, এই দায় হইতে ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার জন্য, বার বার বলিতেন—"আমায় কাজ কর্‌তে হবে, মোক্ষ মুক্তি আত্মোন্নতির যুক্তি, সাধনা আমায় এক তিল আট্‌কে রাখতে পারে না, আমি ভৃত্য, রামকৃষ্ণের গোলাম, কাজের ভার দিয়ে গেছেন, আমার বিশ্রাম নাই!" তারপর অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতেন, "তাঁর কথা মনে আস্‌তে দিই না, জ্ঞানের শৃঙ্খল দিয়ে হৃদয় বেঁধে রাখি—কান্না পায়, ভক্তিতে সব গ'লে যায়, কি ব'লবো, কত প্রেম তাঁর!"

ইহার উপর আর কথা নাই, আত্মসমর্পণের মন্ত্রে দীক্ষা লাভের পরই যার জীবন ইষ্টময় না হয়, বৃথা তার যোগ, বৃথা তার সাধনা, জীবন তার চিরদিনই ব্যর্থ হইবে।

ভারতের কাজ

——:)*(:——

ভারত ছিল স্বামীজীর প্রাণ—অথবা তিনিই ছিলেন ভারতের স্বরূপ। ভারতবর্ষ শুধু যদি একটা দেশ হয়, ভৌগলিক তত্ত্ব ব্যতীত ইহার যদি অন্য কোন অস্তিত্ব না থাকে, তবে অন্য কথা না বলাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু তা নয়, ভারতের মৃণ্ময় মূর্ত্তির পশ্চাতে অমর চিন্ময় সত্তা আছে, ভারতের সাধনায় যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার পরিচয় পাইয়াছেন, স্বামীজী ভারতের চৈতন্যময়ী স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কুমারিকা অন্তরীপে বসিয়া তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ভারতের জাতীয়তা যে কি, তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

স্বামীজী পাশ্চাত্যের মধ্যে দেশ হিসাবে ভারতের পূজা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন নাই, ভারত যে মানব-মুক্তির আদি তীর্থ, এই অগ্নি-বিশ্বাসের বলে, তিনি তাঁর বৈদেশিক শিষ্যগণকে ভারত-ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে চাহিয়া-

ছিলেন, রাষ্ট্র তাই তাঁর চক্ষে তত বড় বলিয়া বোধ হয় নাই, উহা তিনি তুচ্ছ মনে করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের ধর্ম্ম বিরাট বেশে যখন দেখা দিল, স্বামীজী দেখিলেন—অন্য কিছু নয়, ভারতই সনাতন ধর্ম্মের বিগ্রহমূর্ত্তি। ভারতের পূজায়, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধায় জগতের মুক্তি নির্ভর করে, তাই তিনি জগতের ধর্ম্ম-প্রচার-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ভারত-ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রচার করেন। ধর্ম্ম যতক্ষণ তুরীয়, ততক্ষণ ইহা মর্ত্ত্য-জীবনের কোন কাজেই লাগে না, পারত্রিক কল্যাণের নিদান রূপেই গৃহীত হয়, কিন্তু ধর্ম্মকে আস্বাদনের বস্তু করিতে পারে যে, সেই তো সিদ্ধ। ব্রহ্মজ্ঞান বড় বস্তু নয়, প্রেম ভক্তির ফাঁদে ফেলিয়া ব্রহ্মকে জগতের ফাঁদে ফেলার কৌশলই তো উত্তম রহস্য, এই অপূর্ব্ব শিল্প-চাতুর্য্যে যার জীবন মজিয়াছে, সে কি কম রসিক—বেদান্তের মায়াবাদে আগুন ধরাইবার স্পর্দ্ধা তাহারই হয়, স্বামীজীর এইরূপ ব্রহ্মদর্শন হইয়াছিল। বিন্দু হইতে যেমন জগৎ-সৃষ্টি শাস্ত্রসিদ্ধ, তেমনই তিনি ব্রহ্মকে ছানিয়া ছানিয়া নূতন ভারত সৃষ্টি করার আকাঙ্খায়



সিষ্টার নিবেদিতা।

উন্মাদ হইয়াছিলেন,তাই ভারতের মুক্তি-মোক্ষ-প্রয়াসীর কথার উত্তরে হাঁকিয়া বলিতেন, "দাঁড়া—আমি তোদের মহামায়ার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব।" বেদান্ত স্বামীজীর হাতের অস্ত্র হইয়াছিল, স্বপ্ন-রচনার সামগ্রী ছিল না—তাই তাঁর মধ্যে দুর্জ্জয় স্পর্দ্ধা সিংহগর্জ্জন তুলিত।

ধর্ম্মের নেশা যখন ঘন হয়, ধর্ম্ম তখনই রূপ ধরে, সে রূপ তিনি নিজেই আঁকিয়াছেন—ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিয়া, পাশ্চাত্য শিষ্যমণ্ডলীর হাতে নির্দ্দেশদণ্ড দিয়া মানচিত্রের রেখায় রেখায় উহা স্থাপন করিয়া সযত্নে দেখাইতেন, ঐ দেখ হিমালয়—উমানাথ শঙ্করের কৈলাস-ভবন, জগতের গরল আকণ্ঠ পান করিয়া উনি নীলকণ্ঠ, প্রেমবিভোর বিষ্ণুপাদ-নিঃসৃত পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীধারা মাথা পাতিয়া ধরিয়াছেন, জগতের হিতে তিনি উন্মাদ কাঙ্গাল, ঐ অযোধ্যা, রাম-সীতার অপূর্ব্ব কাহিনী ঐস্থানে এখনও স্মৃতি-বিজড়িত আছে। ঐ বৃন্দাবন, পুরুষোত্তমের লীলাভূমি, ঐ যমুনা, বংশীবটে এখনও বুঝি মুরলীধ্বনি শুনা যায়। কাশী, কাঞ্চী,

মিথিলা, হস্তিনা—ভীষ্ম, দ্রোণ, পরীক্ষিৎ, জনমেঞ্জয়, নল, দময়ন্তী, ভারতের পৌরাণিক কথার সহিত পরিচয় দিতে দিতে স্বামীজী উন্মাদ হইতেন। তিনি ভগ্নী নিবেদিতাকে ধর্ম্মলাভের সহজ নির্দ্দেশ দিয়া বলিতেন, "গঙ্গা স্নান কর, তুলসীতলায় প্রদীপ দাও, ভারতের রীতিনীতির সহিত পরিচয় কর"—ধর্ম্মলাভের অব্যর্থ উপায় ভারতের তীর্থে জগৎকে দীক্ষা দেওয়া, ইহাই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়াছিল, তিনি ইহা দর্শন করিয়াছিলেন।

ভারতের মুক্তি সেই দিন, যে দিন জগৎ এই তীর্থে ধর্ম্মের জন্য মাথা নত করিবে, ইহা শুধু কথায় নয়, প্রাণ ঢালিয়া সার্থক করিতে হইবে, এই জন্য তিনি ধর্ম্মের জয় দিতে একদল সৈনিক গড়ার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন—সবল সুস্থ শরীর, স্নায়ুপেশী দৃঢ়, ইস্পাতের মত শক্ত—শিক্ষায় নিপুণ, দীক্ষিত সন্তান-বাহিনী গড়িয়া, তাঁর মনে ছিল, ভারতের সমস্ত সমষ্টি প্রাণকে দিগ্বিজয়ে বাহির করিতে হইবে।

তিনি ভারতে আসিয়া দেশের কাজ যে ভাবে সিদ্ধ

করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত কয়েকটী নির্দ্দেশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

১। জাতিভেদের আবর্ত্ত ধ্বংস করিয়া, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তন করা।

২। বিবাহের অনাহত প্রবাহ রুদ্ধ করা, অতি লক্ষ্মীছাড়াও বিবাহ করিতে চাহে, ইহাতে প্রতিজনে দশজন করিয়া গোলামের সংখ্যাই বৃদ্ধি করে,—যাহাতে বহুজন অবিবাহিত জীবন যাপন করে, তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

৩। অভিজাত শ্রেণীর সহিত জনসাধারণের ঐক্য সাধন করিতে হইবে, সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষার অপেক্ষা, তাহাদের উপায়ক্ষম করিয়া তোলার দিকেই অধিক ঝোঁক দিতে হইবে।

৪। সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। তিনি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহাদের সতর্ক করিয়া বলিতেন, মনে রাখিও—ভারতের দুর্দ্দিনে ইহারাই শিক্ষা সাধনা রক্ষা করিয়াছে, নতুবা সংস্কৃত বিদ্যা দেশ হইতে লোপ পাইত।

৫। নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেখানে শক্ত ও চিন্তাশীল মানুষ গড়া যাইবে, শিক্ষক ও ছাত্র উচ্চ আদর্শে একত্র বাস করিবে।

৬। এমন উচ্চ ব্যষ্টি চরিত্র গড়া চাই, যাহাতে সংসার ও সমাজজীবন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

৭। মতভেদ যতই হউক, প্রেম ও ঐক্য যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৮। তরুণদের তৈরী করিতে হইবে, যাহারা বিদেশে গিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিবে ও তাহাদের নিকট হইতে কার্য্যকরী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া দেশে আসিয়া জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে।

স্বামীজীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও তাঁহার সহকারীগণের প্রাণপণ যত্নে, ভারতে নূতন কর্ম্মস্রোত দেখা দিল, মরা গাঙে জোয়ার আসিল। বাঙ্গালীর শুষ্ক দেহপঞ্জরে নব মুকুল ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি নিজের জীবন-প্রদীপের তৈল ঢালিয়াই জাতিরক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন, জাতির মজ্জা ছানিয়া পরমায়ুর উৎস আবিষ্কার

করিতে পারেন নাই, তাই দিন দিন তাঁর আয়ু ক্ষয় হইতে লাগিল—দ্বিতীয় বার তাঁর বিলাত যাত্রা, অবসাদ ঘোর কাটাইবার প্রয়াস—তাঁর কাজ ফুরাইল—ভারতের কাজ তিনি আরম্ভ করার আভাসই দিলেন, ছাঁচ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইল না।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ঠাকুরের নিকট উপনীত হন, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর স্বামীজীকে আত্মদান করিয়া লীলা সংবরণ করেন, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ঠাকুরের বিগ্রহমূর্ত্তিরূপে দক্ষিণেশ্বরের মহিমা বিশ্বময় প্রচার সুরু করিয়া প্রায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তিনি ভারতে আসিয়া ঠাকুর তাঁহাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন,তাহার স্থায়ী ভিত্তি রচনায় সব শক্তিই ঢালিলেন, বিদেশ হইতে ভারতের কর্ম্মসিদ্ধির উপকরণ সংগ্রহও করিয়াছিলেন, কিন্তু এই মরা জাতিকে প্রাণ দিতে গিয়া নিজেই প্রাণ দিলেন, যে আশায় শত বৎসর জীবিত থাকার আকাঙ্খায় পাগল হইয়াছিলেন, সে আশা অঙ্কুর সৃষ্টি করিয়াই শুকাইল।

যে কথা আমাদের বলিবার, স্থান কালের অপ্রশস্ততায়

তায় তাহা কতটুকু বলিতে পারিব জানি না, ভগবানের কৃপায় সুযোগ পাইলে, তাঁর মর্ম্মব্যথার সাড়াটুকুও যদি দিতে পারি তবেই এ পুণ্য প্রসঙ্গ আলোচনা সম্পূর্ণ হইবে, ঠাকুরের ব্যথা বুকে লইয়া যিনি আত্মাহুতি দিলেন, তাঁর ব্যথার মোচড় যদি তরুণের বুকে না বাজে, তবে ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

স্বামীজীর জীবনবেদ লইয়া আলোচনা সহজ কথা নয়, সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার-সঙ্কল্প যাঁর জীবনের লক্ষ্য, উন্মার্গচিত্ত বিমূঢ় দেশ সে মহাপুরুষের মর্ম্মমন্ত্র যথার্থ-রূপে উপলব্ধি করিবে কেমন করিয়া? 'গীতা গীতা' বলিতে বলিতে অতি অজ্ঞ জনও যেমন গীতার সার সত্য অবধারণ করে, তদ্রূপ স্বামীজীর জীবনকথার চর্চ্চা করিতে গিয়া যদি কিছু বোধগম্য হয়, এই আশায় তাঁর পুণ্য জীবনের আলোচনা।

স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণের চরণধুলি স্পর্শ করার সুযোগ জীবনে ঘটিয়াছিল—ঠাকুর কায়াত্যাগ করিলে তাঁর এই ছায়ামূর্ত্তি ধরিয়া, নবযুগের দেবতাকে বুঝা ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি ছিল না, আজও এই

অভ্রান্ত বিশ্বাসে স্বামীজীর পুণ্য স্মৃতির সহিত ত্যাগ-বৈরাগ্যে দীক্ষিত সন্ন্যাসী সন্তানগণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি—তাঁহাদের অমিয় কণ্ঠে এ কাঙ্গালের কণ্ঠ যেন যোগ দিয়া বলিতে পারে "জয় রামকৃষ্ণ।"

স্বামীজীর বাণী আজ ঘরে ঘরে প্রচারিত, এ ক্ষেত্রে ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—তবে তিনি যে সন্ন্যাস ধর্ম্মে বাঙ্গালীকে দীক্ষা দিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে সন্ন্যাস প্রাচীন ভারতের মায়াবাদ নয়, তিনি এই নব-যুগের সন্ন্যাসীদের শিরায় শিরায় এমন অগ্নি-স্রোত অনাহত প্রবাহে সংরক্ষণ করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, এমন তপস্থার হোমকুণ্ড হৃদয়ে জ্বালিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাতে তাহারা অক্লান্ত চিত্তে অকাতরে বিশ্বহিতে জীবন ঢালিয়া দিবে, আত্মমুক্তি ও উন্নতির জন্য কোনরূপ কুণ্ঠা করিবে না। তিনি বলিতেন, পৃথিবীর ইতিহাস এইরূপ কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের জীবনকথা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, বাংলার সন্ন্যাসী নূতন ইতিহাস গড়িয়া তুলিবে—মরণস্রোত রুদ্ধ করিয়া জাতিকে দিব্য-জীবন দেওয়ার এই আকুলতা কিরূপ

প্রবল ছিল, নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যায়। তাঁর অভ্রান্ত ধারণা—মানুষ মরে, যখন সে অনন্ত শক্তির উৎস হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষের পক্ষে যাহা, সমাজ-দেশ-জাতির পক্ষেও এই একই কথা। শক্তিহীন হইলেই সব কিছু মৃত্যুর খোরাক হয়। এই শক্তিসাধনার বিপরীত ধর্ম্মকে তিনি বড় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, অশ্বিনীবাবুকে তাই বলিয়াছিলেন, গীতা, উপনিষদ্, বেদ আমি তুচ্ছ করি, যদি ইহা শক্তি-সাধনার অন্তরায় হয়।

আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, যখন তিনি গুরুভ্রাতৃগণের সহিত নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে সংহতিবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস করিতেছিলেন, তখন তাঁর এক গুরুভ্রাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ঠাকুরের কাজ করার উপযুক্ত নও, কেন না তিনি ভক্তি-সাধনায় ভগবানকে পাওয়ার পথই দেশকে দেখিয়ে গেছেন, তোমার কথা, এখানে যাও, সেখানে যাও, প্রচার কর, সেবাধর্ম্ম নাও, এই সব বহির্ম্মুখী কর্ম্মে ঠাকুরের অন্তর্ম্মুখী তপস্যা ক্ষুণ্ণ হবে।" স্বামীজী

এইরূপ কথায় বিশেষ বিচলিত না হইয়া, প্রথমটা ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, যেমন গুরু তার তেমন চেলাই বটে, প্রহ্লাদের মত অক্ষর দেখেই কেঁদেই সারা, আর এগোবার সাধ্য নেই—নেহাৎ নাবালক তোমাদের ভক্তি ঠাকুরের স্তুতি পর্য্যন্তই গড়াবে, তোমরা ভাব, জীবন-ভোর কেবল ঠাকুরের গুণকীর্ত্তন করে' কাটাবে, আর নিদান কালে তিনি এসে তোমাদের স্বর্গে তুলে নিয়ে যাবেন। অপদার্থ—শাস্ত্রচর্চ্চা, প্রচার, দরিদ্র নারায়ণের সেবা তোমাদের চক্ষে মায়া—কেননা ঠাকুর ব'লেছিলেন, আগে ভগবান, তার পরে কাজ, আর তোমরা তাই ব'সে আছ!" বলিতে বলিতে স্বামীজীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল, মুখে যেন অগ্নি উদ্গিরণ করিল, "এই যদি রামকৃষ্ণ হয়, আমি তাঁকে চাই না, যে ভক্তি মানুষকে পঙ্গু করে, তা আমার ধর্ম্ম নয়। আমি শাস্ত্রও চাই না, আমি চাই এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন জাতিকে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করাতে, কর্ম্মযোগে তাদের দীক্ষা দিতে—এই জন্য যদি হাজার বছর নরক

হয়, আমি হাসিমুখে তা বরণ করে নেব। আমি কারু ভৃত্য নই, কেউ আমার প্রভূ নয়. আমি তার আদেশই মাথা পেতে নেব, যে নিজের ভক্তি মুক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে, অপরের সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রবে।" স্বামীজী ভাবসমাধিমগ্ন হইলেন; গুরু-ভ্রাতৃগণ স্তব্ধপ্রায়, এক ঘণ্টা পরে স্বামীজী অশ্রুসিক্ত নয়নে ঠাকুরের কথা বলিতে গিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন, স্বামীজীর জীবন রামকৃষ্ণময়।

স্বামীজী বলিতেন, "কাজ করে ভগবান, মানুষ নয় —রামকৃষ্ণ আমার ভগবান। কালী, ব্রহ্ম, যত দেব-দেবী সব এই একই নামীর মধ্যে আমি দেখি, পৃথিবীর বিরুদ্ধতা ভ্রূক্ষেপ করি না—আমি ইহা প্রত্যক্ষ করেছি।" তার চক্ষে তখন বিশ্বাসের আগুন ঠিকারিয়া পড়িত—সাধু নাগমহাশয় তাই বলিয়াছিলেন "নরেন্দ্র খাপখোলা তলোয়ার।"

ভগবানের জন্য আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হওয়া চাই, নিজের উপর স্বামীজীর অটুট শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তিনি ঠাকুরের আসন অত উচ্চে স্থাপন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

তিনি বলিতেন—যদি বুদ্ধি ও হৃদয় পরস্পর দ্বন্দ্ব করে, তবে বুদ্ধির যুক্তি ছাড়িয়া, হৃদয়ের অনুসরণ করিবে, ইহা যে কি অমৃতময় নির্দ্দেশ, তাহা আত্মযুদ্ধে জয়ী হইতে যে উদ্যত সেই বুঝিবে, এই অব্যর্থ উপদেশ বাঙ্গালী যদি প্রত্যয় সহকারে গ্রহণ করে, তবে দিব্য জীবন লাভের পথ সুগম হইবে।

স্বামীজীর জীবনপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে দুই জন মহাপুরুষের কয়েকটা কথা উল্লেখ না করিলে, ইহা যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণ ব্যতীত, ঠাকুরের যে সকল গৃহস্থ ভক্ত স্বামীজীর উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন, যাঁহারা স্বামীজীকে ঠাকুরের অঙ্গ-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ও সাধু নাগমহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজী বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, একদিন যখন শিষ্যগণের সহিত বেদের আলোচনা করিতে-ছিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরীশবাবুকে দেখিয়াই স্বামীজী বিদ্রূপচ্ছলে

বলিলেন, "জি, সি, আঁপনারা এই সব জ্ঞানচর্চ্চার চেয়ে, সেকেলে কেষ্ট বিষ্ণুর নাম নিয়েই দিন কাটান কেমন করিয়া ?"

গিরীশ বাবুর অপূর্ব্ব প্রতিভায় বাংলার নাট্যজগৎ আজ উদ্ভাসিত, ঠাকুরের চরণে অকপট আত্মদান করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন, স্বামীজির চরিত্র তাঁর নিকট বিশেষ ভাবেই জানা ছিল, স্বামীজী যখন যাহা লইয়া পড়িতেন, সেই বিষয় এত বড় করিয়া দেখিতেন, যে অন্য বিষয়ের প্রতি আর নজর দিতেন না, ভক্তি বিশ্বাস স্বামীজীর যে কম ছিল তা নয়, তবুও তাঁর শিষ্যগণের মনে পাছে কোনরূপ বিকৃত ধারণা উপস্থিত হয়, এই জন্য গিরীশচন্দ্র বলিলেন, "স্বামীজী, বেদ প'ড়ে আমার কি হবে, সে সময়ও নেই, বুদ্ধিও নেই, দূর থেকেই নমস্কার করি।" তারপর বেদের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "আমি ঠাকুরের করুণায় হাস্‌তে হাস্‌তে ভবনদী পার হবো, তোমায় তিনি এইসব প'ড়তে দিয়েছেন, পড়, কিন্তু স্বামীজী—"কোন বিষয়ের অভিব্যক্তি দেওয়ার শক্তি গিরীশ বাবুর কিরূপ



৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অসাধারণ ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য, তিনি বলিলেন "কিন্তু স্বামীজী, এই বেদের পাতায় এমন ব্যবস্থা আছে কি, যা দিয়ে দেশের হাহাকার দূর হয়. অন্নহীনের মুখে অন্ন দেওয়া যায়, ব্যাভিচার, পাপ, অত্যাচার নিবারণ হয়—আমি জানি, যে বাড়ীতে একদিন পঞ্চাশজন পাত পেতে ভাত খেতো, সেই বাড়ীর গৃহিণী আজ অনাহারে মরতে চলেছে, অমুখ বাড়ীর অসহায়া বিধবার উপর দুর্ব্বৃত্ত এমন অত্যাচার করেছে, যে আত্মহত্যা করলে, ঘরে ঘরে পাপ, ভ্রূণ-হত্যা, অবলার নির্য্যাতন, এই সব দুঃখের প্রতীকার তোমার বেদে আছে কি ?"

স্বামীজী গিরীশবাবুর মুখের দিকে তাকাইলেন, দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিল, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল—তিনি গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। গিরীশবাবু শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই তোমাদের স্বামীজী, এই প্রাণ তোমরা লাভ কর, তোমাদের স্বামীজী একাধারে জ্ঞানী পণ্ডিত কিন্তু ঈশ্বরভক্ত, মানবপ্রেমে বিভোর!" স্বামীজী পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "শোন জি, সি. পৃথিবীর দুঃখ নিবারণ করতে যদি হাজার জন্ম নিতে হয়—

মানুষের ব্যথার এক কণা বহন করতে যদি নরক হয়, তাও শ্রেয়ঃ, কি ছার ব্যক্তিগত মুক্তি, আমি সর্ব্বজীবকে এই পথে নিয়ে ছুট্‌বো।"

এই দিন হইতেই যে গিরি-নির্ঝর পাথরচাপা ছিল, তাহা সহস্রমুখী হইয়া উৎসরিত হইল, গিরীশ বাবুর এই ইন্ধন স্বামীজীর জীবনে লোকৈষণার প্রবলতর আগুণ জ্বালাইয়া দিল।

আর একদিন তিনি উপনিষদ্ লইয়া চর্চ্চা করিতেছিলেন, সাধু নাগমহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্বামীজী পুস্তক বন্ধ করিলেন—নাগমহাশয় ঠাকুরের আদেশে সংসারেই ছিলেন, কিন্তু জীবন তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্যপ্রদীপ্ত। স্বামীজীর মতই তিনিও ঠাকুরের আর এক দিক ফুটাইয়া তুলিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, একজন ভাগবত প্রেমে উন্মাদ, আর একজন ভাগবত আনন্দ দিয়া নূতন ভারত গঠনে উদ্বুদ্ধ, এই দুই দিব্য পুরুষের মিলন-ক্ষেত্র যেন স্বর্গে পরিণত হইল।

নাগমহাশয় বলিলেন, "জয় শঙ্কর, জীবন্ত শিব দর্শন হলো, ধন্য আমি।" স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেমন আছেন ?" নাগ মহাশয়ের দেহজ্ঞান ছিল না, বিষয়-বোধ রাখিয়া তিনি জীবিত ছিলেন না, জীবন্মুক্ত পুরুষের তিনি আদর্শ, স্বামীজীর কথার উত্তরে বলিলেন "এই রক্ত মাংসের খাঁচার কথা জিজ্ঞাসা করছেন—সে খবর কে রাখে ? শিব ! শিব !!" এই বলিয়া ভূমিষ্ট প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে ঠাকুরের কথা বলার জন্য অনুরোধ করিলে—তিনি বলিলেন, "কি বল্‌বো তাঁর কথা, আমি মহাবীরের দর্শনে ধন্য হ'তে এসেছি, ঠাকুরের লীলা পূর্ণ কর—জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ !!" স্বামীজী নাগ মহাশয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি ঠাকুরকে চিনেছেন, আমরা হাঁতড়াচ্ছি।" নাগমহাশয় বিস্ময়পূর্ণ বদনে কহিলেন, "অমন কথা মুখে আন্‌বেন না, মুদ্রার একদিক ঠাকুর, অপর একদিক আপনি—একই দুই, দুইই এক।"

স্বামীজী অন্যান্য কথার পর বলিলেন, "দেশকে জাগিয়ে তোলা ছাড়া আর আমার অন্য কোন কামনা নাই, দেশের প্রাণ ঘুমিয়ে আছে, আত্মশক্তিতে কোনই আস্থা নাই, এই মহাদেশের অনন্ত প্রাণশক্তি সনাতন

ধর্ম্মে যদি জাগিয়ে তুলতে পারি, তবেই জান্‌বো প্রভুর অবতরণ বৃথা হয় নাই, আমরাও বৃথা জন্মাই নি, মুক্তি তুচ্ছ, এই আমার কাজ, আশীর্ব্বাদ করুন—যেন কৃতকার্য্য হই।"

নাগমহাশয় স্বামীজীর কথার উত্তরে বলিলেন, "প্রভুর আশীর্ব্বাদ, এ ইচ্ছা রোধ হবার নয়, প্রভুর ইচ্ছা ও আপনার ইচ্ছা একই, জয় রামকৃষ্ণ।"

স্বামীজীর শরীর তখন ক্রমেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, তিনি বলিলেন, "কাজের জন্য চাই শক্ত শরীর, ভারতে এসে ক্রমেই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছি, কাজ পণ্ড হচ্ছে, উঃ, ইউরোপ ও আমেরিকায় কি স্বাস্থ্যই ছিল!"

নাগমহাশয়—"শরীর থাক্‌লেই খাজনা দিতে হয়, দুঃখ আর ব্যাধি। কিন্তু আপনার সোণার শরীর সযত্নে রক্ষা করা চাই।"

স্বামীজীর শরীর কাজের গুরুভার বহনে অসমর্থ হইয়াছিল, তিনি দুই বৎসর শারীরিক অসুস্থতায় নিজেই বলিতেন, "যেন বিশ বৎসরের পরমায়ু হ্রাস পাইয়াছে।"

স্বামীজীর কর্ম্মধারা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—

১। বেদান্ত প্রচার। ২। স্থানে স্থানে সন্ন্যাসীদের জন্য মঠের প্রতিষ্ঠা। ৩। প্রয়োজনমত সেবাকেন্দ্র স্থাপন। ৪। অনাথ বালক বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা।

দেশের প্রাণ জাগাইয়া তোলার জন্য রামকৃষ্ণ-মিশনের কেন্দ্র তীর্থ হইল বেলুড়, তারপর তিনি চতুর্দ্দিকে সন্ন্যাসীদের কার্য্যে পাঠাইলেন, মাদ্রাজে রামকৃষ্ণানন্দ অভিযান করিলেন, ভগ্নী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নারীজাতির মধ্যে কর্ম্ম করার সূত্রপাত করিলেন, গুজরাটে ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারক প্রেরিত হইল, স্বামী অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে ইংলণ্ড, আমেরিকায় পাঠাইয়া দিলেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি হইল, স্বামীজী সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিলেন, একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এই কর্ম্মের জন্য অর্থ আসিবে কোথা হইতে, স্বামীজী সগর্ব্বে উত্তর দিয়াছিলেন—“আমরা সন্ন্যাসী, বৃক্ষতল আমাদের আশ্রয়, প্রয়োজন হইলে, এই মঠ বিক্রয় করিব, চাই কাজ, টাকার চিন্তা করিও..না।’

সেই মহাপ্রাণ—পতিত দেশের বিদ্যুৎ-শক্তি, বিপুল দেশের গুরুভার মাথায় বহিয়া অসময়ে প্রাণ দিলেন—স্বামীজীর উৎসবে যোগ দিই, কিন্তু সে ব্যথার অনুভূতি আমাদের উন্মাদ করে কি ?



স্বামীজী (মৃগচর্ম্মে) আসীন।

উপসংহার

——:)*(:——

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন লইয়া আলোচনা যথেষ্টই হইয়াছে, তাঁর চরিতচিত্র ঘরে ঘরে বোধ হয় স্থান পাইয়াছে। দেশের এমন শিক্ষিত নারীপুরুষ নাই, যাঁহারা স্বামীজীর চরণে ভক্তিনত শিরে প্রণতি জ্ঞাপন না করে।

বিপুল ভারত ত্রিশ কোটী নরনারীর বাসভূমি। বাংলার লোকসংখ্যা সাড়ে চার কোটী—স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, মাত্র দুই সহস্র সন্ন্যাসী। মুক্তি-মোক্ষের প্রয়াসী নয়, যাহারা ভারতের সনাতন পুনরুদ্ধার সঙ্কল্পে প্রাণ দিবে। এক জন্ম নয়, সহস্র সহস্র জন্ম ইহাই হইবে তাহাদের একমাত্র ব্রত। আর চাহিয়াছিলেন, লোক সংখ্যানুপাতে মাথা পিছু একটী করিয়া টাকা। বিদ্রোহ বিপ্লব নয়, রাষ্ট্রান্দোলন নয়, বিরোধ নয়, বিদ্বেষ প্রচার নয়, ভারতের প্রাণ স্বধর্ম্মে জাগাইয়া

তোলার জন্য মানুষ ও অর্থ যদি পাইতেন—বলিয়াছিলেন দেশের মুক্তি অবধারিত আনিয়া দিবেন।

কাজ হয়তো শক্ত। কিন্তু দুই হাজার প্রাণ-দেওয়ার মত মানুষ কি এই চব্বিশ বৎসরে মিলে না? ইহা খুবই কঠিন কাজ? ভারতে সন্ন্যাসীর সংখ্যা নাকি অর্দ্ধ কোটীর অধিক, মুক্তি মোক্ষ আত্মোন্নতির স্বপ্ন পায়ের তলে ফেলিয়া, জগদ্ধিতায় বহুজনসুখায় এক বাংলা হইতেই কি এই দুই হাজার মানুষ সংগ্রহ সম্ভব করা যায় না? বাঙ্গালী নাকি জাতিগুরু হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছে, স্বপ্ন কাজে পরিণত করার প্রয়াস যদি না দেখা দেয়, তবে এই অলস স্বপ্ন উপহাসের কথা ভিন্ন তো অন্য কিছু নহে। শুনিতে পাই, ইহার জন্য সাধন চাই, সে সাধনা—ঘোর তামসিকতাপূর্ণ নৈষ্কর্ম্ম্য নহে, নিরলস নিষ্কাম কর্ম্ম। যুক্তিবাদী বলেন, ইহা করিতে গিয়া স্বামীজী তো প্রাণই দিলেন, করিলেন কি? এইরূপ অকালপক্ক পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতদের কণ্ঠ রোধ করিয়া, বাহির হও, বাংলার দুই সহস্র নব তান্ত্রিক—শুধু প্রাণ ঢালিয়া যাও, একা স্বামীজীর বক্ষরক্তসিঞ্চনে

ধরিত্রী সাড়া দিয়াছে, তুই সহস্র নরেন্দ্রের শোণিত-মোক্ষণে, মৃণ্ময়ী মাতৃপ্রতিমা সনাতন চেতনায় চিন্ময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক, ধরণীর ভারহরণের ইহাই অব্যর্থ পন্থা।

স্বামীজীর উৎসব করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিও না, স্বামীজীর বজ্রবাণী কণ্ঠে ধরিয়া গর্ব্ব করিও না—এমনই করিয়া আমরা নবদ্বীপ উড়াইয়াছি, হালিসহর ভুলিয়াছি, দক্ষিণেশ্বর এইরূপ হাততালি দিয়া উড়াইবার পথ ক্রমেই প্রশস্ত হইতেছে—সাবধান না হইলে, আর দশ বৎসরের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বরও বাঙ্গালী ভুলিবে। উৎসবে লোকাভাব হইবে না,কিন্তু লঘু জীবনের পরিচয়ে দক্ষিণেশ্বরের সত্য মহিমা ঢাকা পড়িয়া যাইবে।

ঠাকুর যে বৈদ্যুতিক চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—কাশীপুরের বাগানে, তাহারই আবর্ত্তনে বাঙ্গালীর জীবনে যেটুকু শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই প্রায় তাহা নিঃশেষ হইয়াছে। বাঙ্গালীর 'মরণ-চীৎকার উঠিল বলিয়া। আবার চাই এইরূপ নূতন এক বিদ্যুৎব্যূহ—যেরূপ ব্যূহের মধ্যকেন্দ্রে ছিলেন শ্রীমা, আর সতের জন সন্ন্যাসী

তাহার রেডিয়াস্—বেলুড়ের মঠ এই ব্যূহ স্থাপনের বিদ্যুৎ-গৃহ ভিন্ন আর কিছু নহে।

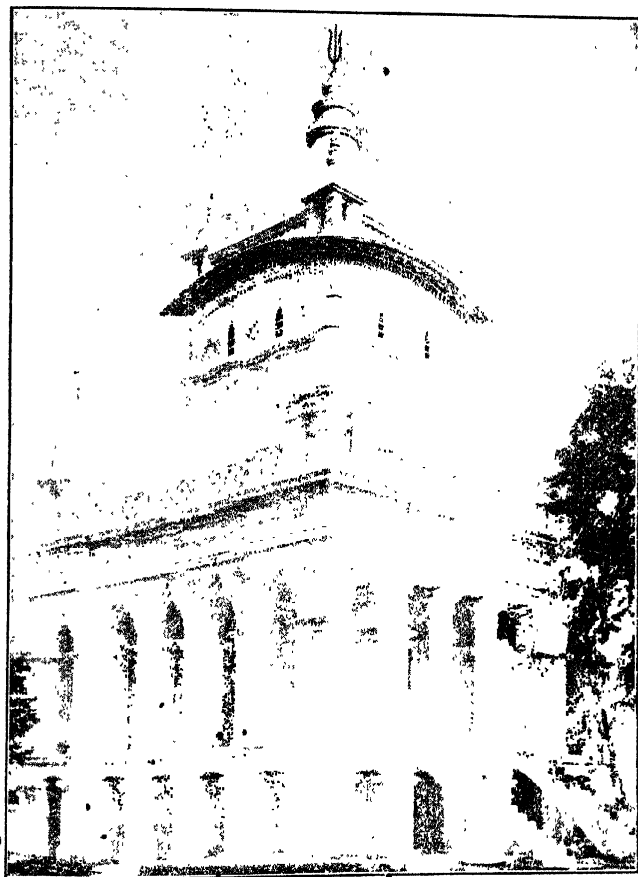
যুগের ধর্ম্ম—আত্মসমর্পণ। শুধু দেহ প্রাণ মন অর্পণ নয়, আত্মার উৎসর্গ। ঐহিক স্বার্থ বলি দিলেই সিদ্ধি নাই, মুক্তি-মোক্ষ, নির্ব্বিকল্প সমাধির আকাঙ্খা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে—বাংলার ইহাই সনাতন—মূর্ত্তিমান বেদ!

দ্বিতীয় কথা, চাই গোত্রান্তরিত নারী ও পুরুষ। দুই কুল বজায় রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরের ধর্ম্ম সার্থক হইবে না। বাংলার গৃহনীড় হইতে দুই হাজার দেবসন্তান বাহির হইয়া আসুক, নরেন্দ্রের জননী সন্তানবিরহে যে অশ্রুবর্ষণ করেন নাই ইহা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু সে অশ্রু আশীর্ব্বাদেরই অর্ঘ্য—দেবহিতে আত্মদান—মাতৃরূপের শতদল কমল ব্যতীত আর কি হইবে? তার পর চাই প্রেম ও ঐক্য। হাজার হাজার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর তো অভাব নাই, কোথায় সে প্রেম, যে প্রেমের আকুলতায় স্বামীজী নয়নের আড়াল হইলে ঠাকুর বক্ষ দেখাইয়া বলিতেন, "এইখানটা কেমন করিতেছে!" সাধ করিয়া কি স্বামীজী বলিয়াছেন, মাথার যুক্তি যদি

বিরোধ বাধায়, হৃদয়ের নির্দ্দেশ লইও। বাঙ্গালী যদি জয় চাও, প্রেমহীন হইও না. প্রেমের বলেই মানুষ আত্মজয় করে, প্রেম কামের শত্রু, কামহীন চিত্ত ঐক্যবল ধারণের উপযোগী। প্রেমের সাধনায় যে সিদ্ধ, ভগবান তার হৃদয়-সিংহাসনে মূর্ত্ত। স্বামীজী জাতির তপস্যা তাই তো লোকহিতে ঢালিতে বলিয়াছেন। ঈশ্বর যার প্রাপ্ত ধন নয়, সে সাধনা করুক সহস্র সহস্র বৎসর। পাওয়া জিনিষকে ছাড়িয়া চলে যে, সেই সাধনার আবর্ত্তে ডুবিয়া মরে। বাঙ্গালী জাতিটা সিদ্ধ জাতি—এ কথায় যদি প্রত্যয় না হয়, তোমরা দক্ষিণেশ্বরের নাম মুখে আনিও না, স্বামীজীর বাণী উচ্চারণ করিও না। কুরুক্ষেত্রের পুরুষোত্তমই তো ধর্ম্ম-সংস্থাপনে আপনাকে মূর্ত্ত করিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরে, কুরুক্ষেত্রের মানবপ্রতিনিধি সব্যসাচীই তো শ্রীনরেন্দ্র বেশে পুনঃ অবতীর্ণ—এ মর্ম্ম বুঝিবে না কি তরুণ বাঙ্গালী? দক্ষিণেশ্বরের নব গীতার অমর সঙ্গীত কি জীবন তোমাদের অমৃতময় করিবে না?

কাজ—অসংখ্য গৃহীর অবদান মাথায় বহিয়া, নব

জাতির অগ্রদূত এই দুইসহস্র নারী পুরুষ দেশের সর্ব্বত্র মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবে। মঠ হইবে সন্ন্যাসীর তীর্থ, সেখানে জাতিগুরু গঠনের আয়োজন করা চাই, যেখান হইতে বেদ উপনিষদের নব নব ঋকের ঝঙ্কারে বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ করিয়া জগতের কেন্দ্রক্ষেত্রে যে চির ভোগভূমি তাহা নির্ম্মল ও কলুষহীন করিবে, গৈরিকের পবিত্র ধ্বজা দোলাইয়া কামকাঞ্চনত্যাগী ত্যাগবৈরাগ্যের দীপ্ত হুতাশনরূপী নবযুগের অবধূত, সন্ন্যাসী, পরমহংস অবনত সমাজের জীবন ছন্দ ভাগবতময় করার জন্য অনন্ত জীবন ঢালিয়া দিবে, মর্ত্ত্য স্বপ্ন নিত্য বোধে, ঊর্দ্ধ্বলোক হইতে অজস্র অমৃতধারা তপস্যার আকর্ষণে নামাইয়া আনিবে অজস্র প্রবাহে। আর আশ্রমে আশ্রমে আদর্শ গৃহী জীবন গঠনের পরম সাধ্য যে প্রেম, তাহা অনাবিল করিয়া তোলার জন্য জগতের মূল উপাদান কাম-কাঞ্চনের শোধন মন্ত্র লইয়া, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের নিখুঁত সমাজ পত্তনের সাধনা করিবে—গঠনযুগের ভবিষ্যচ্চিত্র সার্থক করার আয়োজনই স্বামীজীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ইহাই



স্বামীজীর সমাধি মন্দির, বেলুড়।

তাঁর স্মৃতি-উৎসবের বাস্তব লক্ষণ। আমরা জীবনব্যাপী সাধনায় দেশ ও জাতির মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের ব্যক্ত অব্যক্ত তত্ত্বের অবিকৃত রূপ ফুটাইতে চাই—স্বামীজী যে কাজের সূত্রপাত মাত্র করিয়াছেন, তাহার পরিণত মূর্ত্তিই একটী অখণ্ড ভারত জাতি—সন্ন্যাস ও সমাজ সে জাতি-তত্ত্বের দ্বিদল স্বরূপ, মঠ ও আশ্রম ইহার বীজ—দক্ষিণেশ্বরের বাণী তাই জাতি গঠনের ইষ্ট-মন্ত্র। পরিশেষে, আমরা তাঁর কথাই উচ্চারণ করিয়া এই পবিত্র প্রসঙ্গ শেষ করি, "ঠাকুর যদি পৃথিবীর জন্য প্রাণ দিতে পারেন, আমিও প্রাণ দিব, তোমাকেও দিতে হইবে, তোমাদের প্রত্যেকের প্রাণ দেওয়া চাই। এই যে কাজের কথা বলি, এই যাহা করিতে আমি উদ্যত—ইহা সূচনা মাত্র, আমার কথায় বিশ্বাস কর,—আমাদের বুকের রক্ত দিয়েই ভারতে একদল বীরকর্ম্মীর অভ্যুদয় হইবে, তাহারা ভগবানের সৈনিক, বিজয়ী যোদ্ধা, যাহারা পৃথিবীর নব জন্ম আনয়ন করিবে।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত—

প্রবর্ত্তক গ্রন্থাবলী

—:*:—

যৌগিক সাধন	...	...	।৶০
লীলা	...	...	।৶০
সাধনা	...	...	॥৶০
যুগবার্ত্তা	...	...	৸০
কর্ম্মের ধারা	...	...	৸০
অরবিন্দ মন্দিরে	...	...	॥৶০
উদ্বোধন (নাটক)	...	...	১৲
চণ্ডীদাস (নাটক)	...	...	২৲
পতিব্রতা (নাটক)	...	...	(যন্ত্রস্থ)

— —